সমসাময়িক
মনোবিজ্ঞান

অনিল বন্দ্যোপাধ্যায়
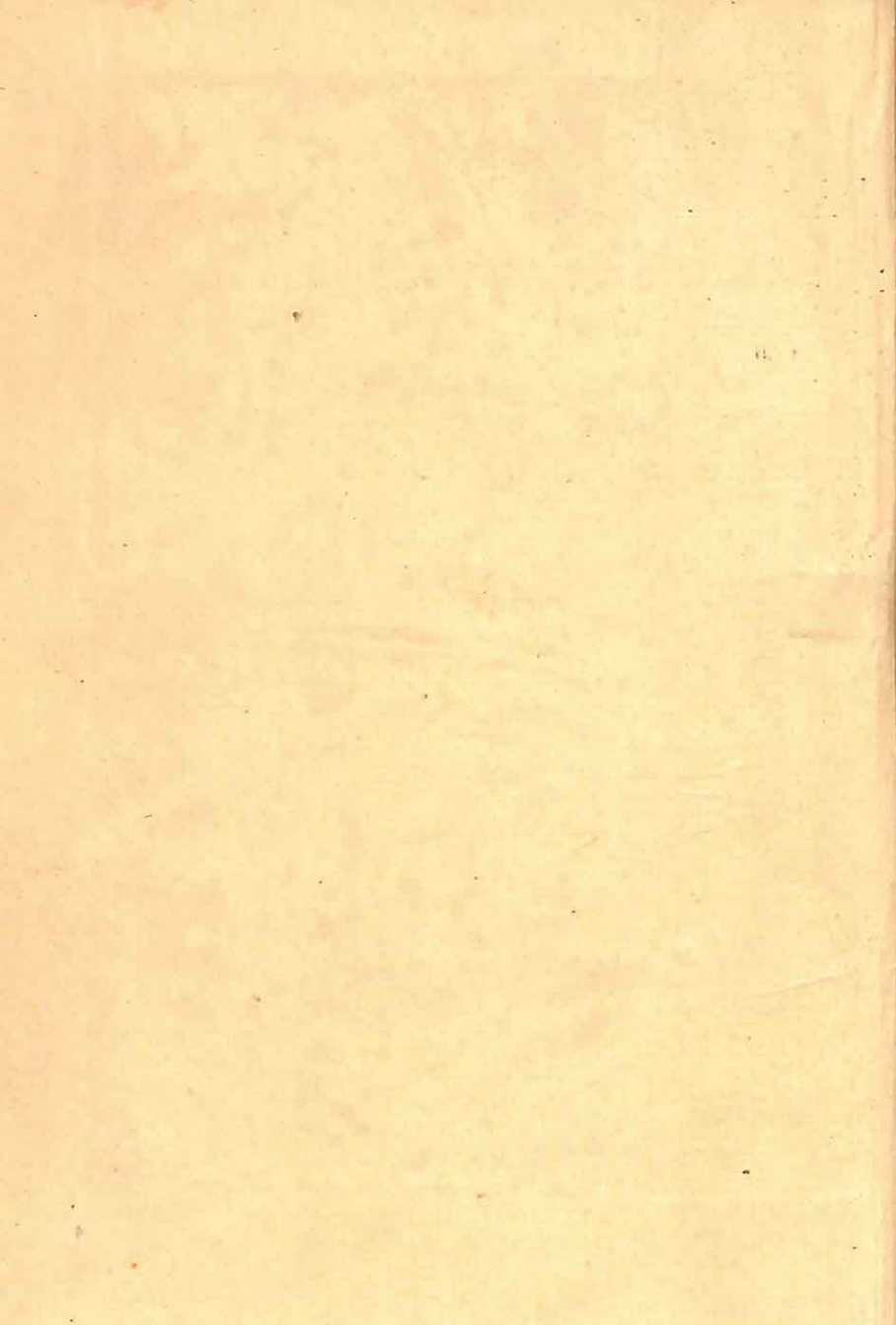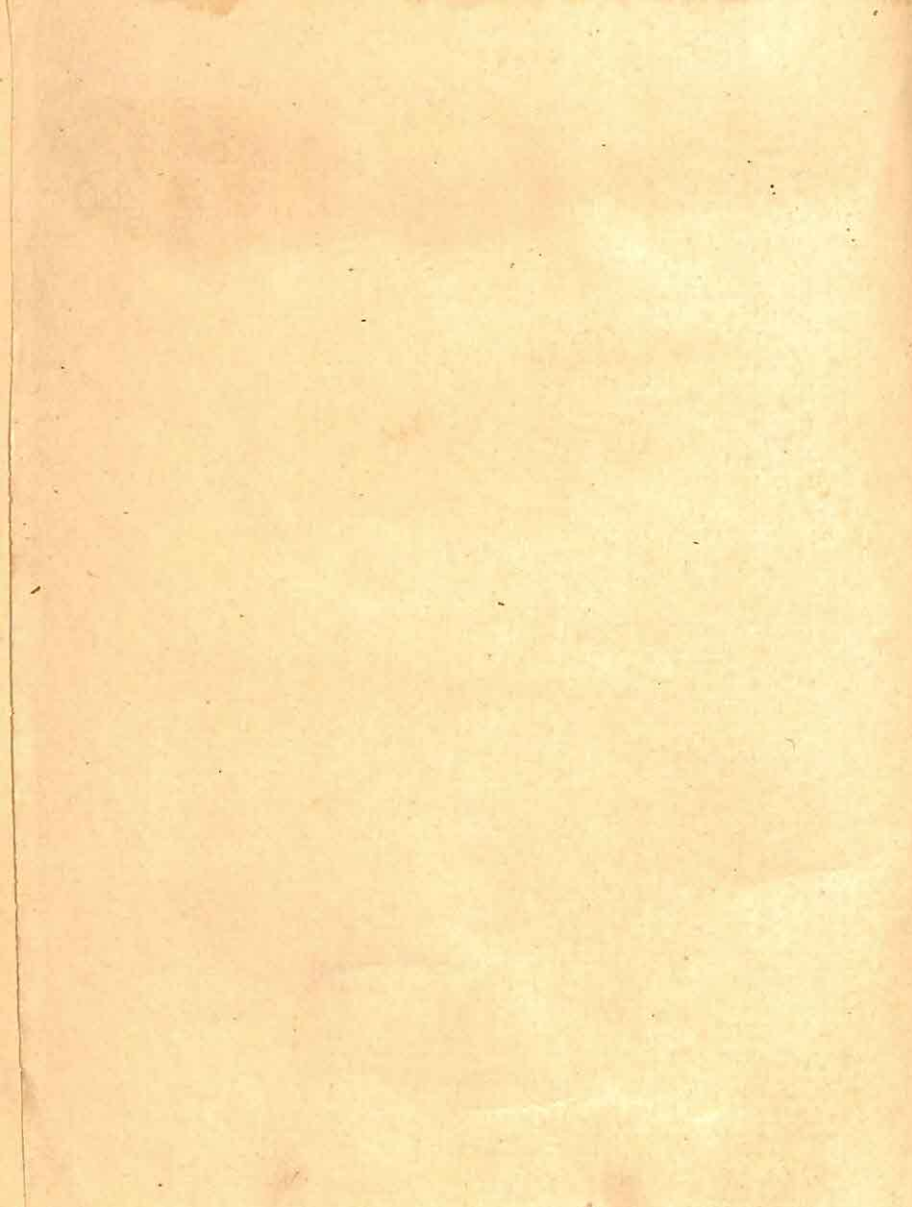
ইণ্ডিয়ানা
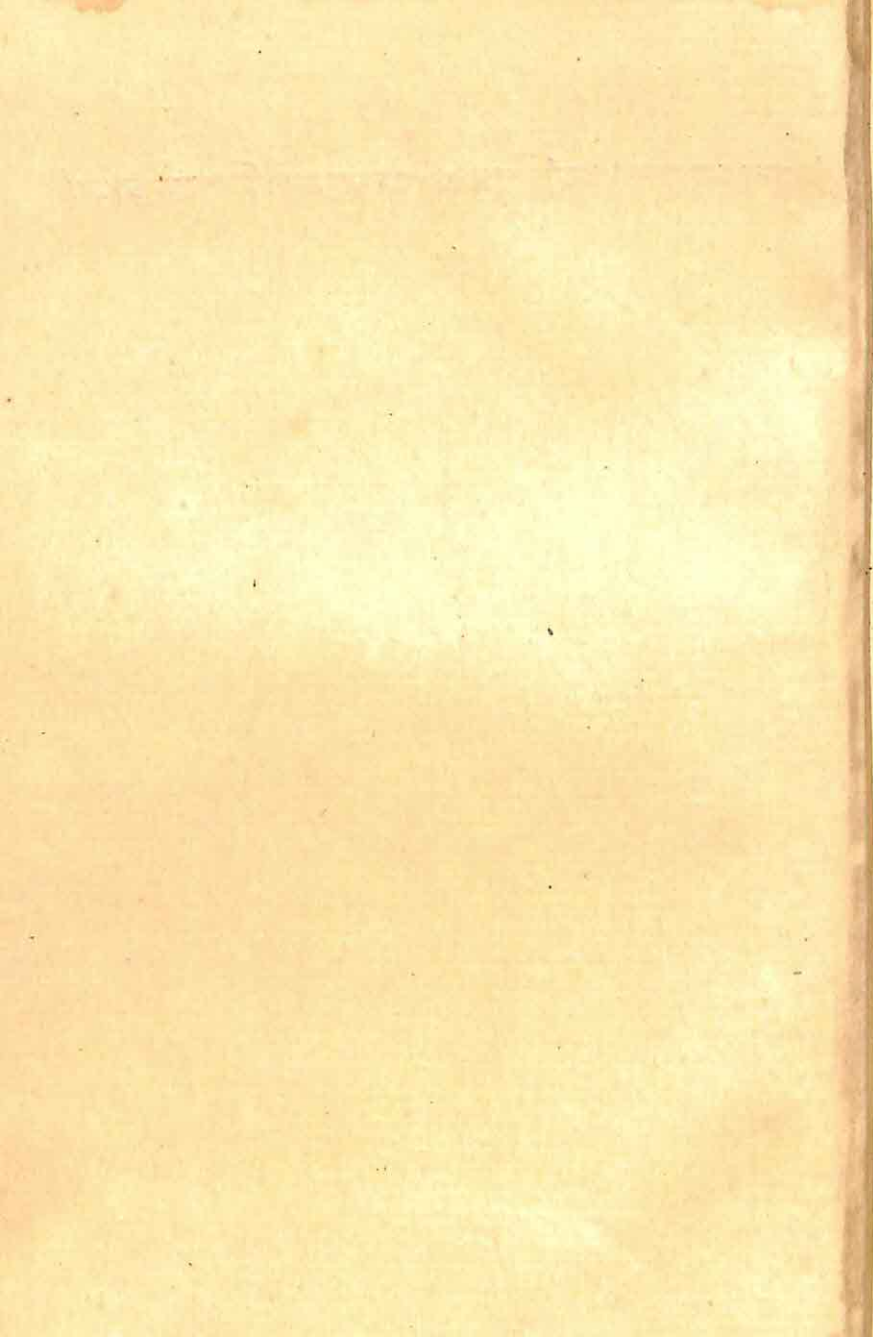
সমসাময়িক মনোবিজ্ঞান

সমসাময়িক মনোবিজ্ঞান
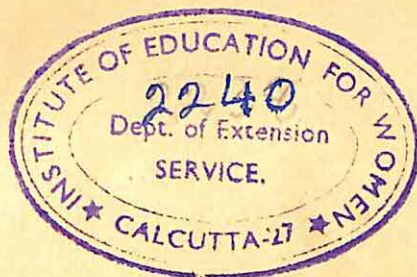
অধ্যাপক অনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ইণ্ডিয়ানা লিমিটেড
২।১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলিকাতা—১২

উৎসর্গ

আমার শিক্ষাগুরু, লখনউ বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের ভূতপূর্ব প্রধান অধ্যাপক, ৺নরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এম, এ, পি-এইচ, ডি (হারভার্ড) মহাশয়ের স্মরণে।

লেখকের কথা

এই বইয়ের মূল পরিকল্পনাটি নেওয়া হয়েছে Wood-worth-এর Contemporary Schools of Psychology নামক বই থেকে। তবে সে বইয়ের অনুবাদ এ নয়। এর কয়েকটি অধ্যায় স্বতন্ত্রভাবে এর আগে বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিলো। সেইগুলিকে কিছু কিছু পরিবর্তন করে কোন কোন অংশ সম্পূর্ণ নতুন করে, আর দু' একটি অধ্যায় তাদের সঙ্গে যোগ করা হয়েছে। পরস্পরের মধ্যে, যাতে যোগসূত্র থাকে সেদিকে দৃষ্টি রেখে এখানে তাদের প্রকাশ করা হলো।

ইদানিং বাংলা ভাষায় নানাপ্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই রচনার উদ্যম দেখা দিয়েছে। মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধেও কয়েকখানা বই বাংলায় হয়েছে। তাদের কাহারও কাছ থেকে সাহায্য নেওয়া আমার সম্ভব হয়নি। ভাষা ও পরিভাষা সম্পূর্ণ নিজের। প্রকৃত তথ্য ও তত্ত্বকে বিকৃত না করে কোন বিজ্ঞানের যথাযথ ও চিত্তাকর্ষক পরিচয় দেওয়া যে কতো কঠিন তা সকলেই জানেন। কাজেই এ-সম্বন্ধে কোন কৈফিয়ৎ আমার নেই। এ বিষয়ে একমাত্র যাঁর কাছ থেকে আমি সাহায্য পেয়েছি তিনি হচ্ছেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান

বিভাগের ভারপ্রাপ্ত প্রধান অধ্যাপক পরম শ্রদ্ধেয় ডক্টর শ্রীসুহৃৎচন্দ্র মিত্র (এম, এ, ; পি-এইচ, ডি ; এফ, এন, আই) মহাশয়। প্রচলিত অর্থে আমি তাঁর ছাত্র নই। তবু যে স্নেহ উৎসাহ তাঁর কাছে থেকে আমি পেয়েছি, যে কোন ছাত্রের পক্ষেই তা অমূল্য সম্পদ। নানা কর্মব্যস্ততা ও নিজের শারীরিক অসুস্থতার মধ্যেও তিনি এই বইয়ের পাণ্ডুলিপিটি আগাগোড়া পড়েছেন. ও তাঁর অমূল্য উপদেশ দিয়ে আমার ভুল-ত্রুটি সংশোধন করে দিয়েছেন। এবং শেষ পর্যন্ত একটি ভূমিকাও তিনি লিখে দিয়েছেন। এ বইয়ের পক্ষে সেইটেই সবচেয়ে বড়ো গৌরব।

'সমগ্রতাবাদ' অধ্যায়টির অংশ-বিশেষের প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বক্তব্যটি অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট করায় আমাকে সাহায্য করেছেন বন্ধুবর ডক্টর অরবিন্দ পোদ্দার (এম, এ ডি, ফিল) মহাশয়। তাঁকে আমার ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

৫, ১, ৫৩। শ্রীঅনিলকুমার বন্দোপাধ্যায়

ভূমিকা

মনোবিদ্যার দ্রুত প্রসার এ যুগের বিজ্ঞান জগতের একটি বিশেষ ঘটনা। বাস্তব জীবনে মনোবিদ্যার উপকারিতা ক্রমশঃ সকলে উপলব্ধি করিতেছেন বলিয়া ইহার সম্বন্ধে কৌতূহলও যেমন বৃদ্ধি পাইতেছে, ইহার চর্চার ক্ষেত্রও তেমনই বিস্তীর্ণ হইতেছে। কিন্তু দ্রুত প্রসারের দোষগুণ দুই-ই আছে। সকলের পক্ষে সব তত্ত্ব সব সময়ে সহজে বোধগম্য হয় না। কিন্তু তত্ত্ববিশেষের একটি অংশের একটি আকর্ষণী শক্তি থাকায় লোকে সেই অংশটিকেই সমগ্র তত্ত্ব হিসাবে ধরিয়া লইয়া অনেক সময়ে কর্মজীবনে তাহার ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হয়। তাহাতে সমাজের কল্যাণের পরিবর্তে অকল্যাণই সাধিত হয়। মনোবিদ্যার ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নয়। বৈজ্ঞানিক-ভাবে মন সম্বন্ধে আলোচনা করার একটি প্রধান অন্তরায় এই যে, সকলের মনেই একটা ধারণা থাকে যে, তাঁহারা তাঁহাদের নিজেদের মন সম্বন্ধে সব কিছুই জানেন। এবং এই কল্পিত জ্ঞানের মাপকাঠিতেই তাঁহারা অন্যের তত্ত্বসমূহ বিচার করেন। তাহাদের এই ভ্রান্ত ধারণা দূর করিবার একটি উপায় হইতেছে মন সম্বন্ধে কত রকমের আলোচনা, এবং কত ধারণা করা হইয়াছে তাহার সহিত পরিচিত হওয়া।

গ্রন্থকার তাঁহার এই পুস্তকখানিতে উনবিংশ শতাব্দি হইতে আরম্ভ করিয়া এ যাবৎ মন সম্বন্ধে যত প্রকারের গবেষণা হইয়াছে তাহার পরিচয় দিয়াছেন। Macdaugall. Kohler, Pavlov, Freud, Jung, Adler প্রভৃতি মনীষিদের নূতন নূতন তত্ত্বসমূহ বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। বাংলা ভাষায় মনোবিদ্যা সম্বন্ধে কৌতূহলী পাঠক এই পুস্তক পাঠে যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করিবেন বলিয়াই আমি মনে করি। মনোবিদ্যার ছাত্রদেরও ইহা বিশেষ উপকারে আসিবে।

গ্রন্থকার কল্যাণীয় শ্রীমান অনিলকুমারের অনেক প্রবন্ধ নানাবিধ মাসিক পত্রিকায় ইতিপূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার ভাষা এবং বলিবার ভঙ্গি সরল এবং সহজবোধ্য। উৎসাহ, অধ্যবসায় নানাবিধ বিষয়ের জ্ঞান লাভের আকাঙ্খা এবং চেষ্টা ছাত্রাবস্থায় তাঁহার প্রকৃতির বিশেষত্ব ছিল। তাঁহার পুস্তকখানির বহুল প্রচার হউক এবং তাঁহার শ্রম সার্থক হউক এই কামনা করি।

শ্রীসুহৃৎচন্দ্র মিত্র

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
মনোবিদ্যা বিভাগ
৯২ আপার সারকুলার রোড
কলিকতা—৯
৩০, ১২, ৫২।
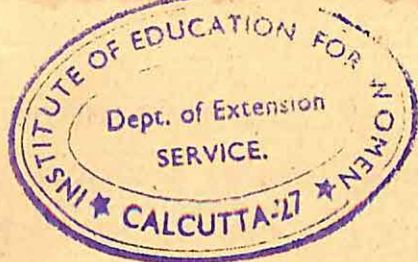
সমসাময়িক মনোবিজ্ঞানের উৎস

জ্ঞান বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার তুলনায় মনোবিজ্ঞানের বয়স অপেক্ষাকৃত কম। বলা যেতে পারে যে নিজস্ব এক বিশেষ ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্য নিয়ে সে দেখা দিয়েছে এই বিংশ শতাব্দীতেই। অবশ্য এর আগে যে তার কোন অস্তিত্ব ছিলোনা, সেকথা বললে ভুল হবে। প্রকৃত পক্ষে, মনের প্রকৃতি ও কার্যকলাপ সম্বন্ধে মানুষের কৌতূহল ও চিন্তা হিসেবে, মনোবিজ্ঞান বহু পুরাতন। কিন্তু মানুষের অভিজ্ঞতা, জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ ও উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মনোবিজ্ঞানকেও অতিক্রম করতে হয়েছে নির্দিষ্ট কতকগুলি স্তর। কাজেই আদি যুগে যে রূপ ও আয়তন তার ছিলো, আজকের দিনে তা আর নেই। এমনকি বিষয়বস্তু, লক্ষণ ও পদ্ধতির দিক থেকেও যথেষ্ট পরিবর্তন তার হয়ে গেছে। সমসাময়িক মনোবিজ্ঞান বলতে যে জিনিষটা আমরা বুঝি তা প্রধানতঃই বিংশ শতাব্দীর অবদান। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর এই যে সমসাময়িক মনোবিজ্ঞান, এর আবির্ভাব একেবারে আকস্মিক নয়। এর একটা ইতিহাস আছে, এবং সেই ইতিহাসের ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যাবে উনবিংশ শতাব্দীর চিন্তাধারার মধ্যে।

উনবিংশ শতাব্দীতে মনোবিজ্ঞানের স্বতন্ত্র কোন অস্তিত্ব ছিলো না। সাধারণ দর্শন শাস্ত্রের একটি বিভাগ হিসেবেই তাকে গণ্য করা হতো। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি এসে এই ব্যবস্থা বজায় রাখা আর সম্ভব হয়ে উঠলো না। মনোবিজ্ঞানের যে সংজ্ঞা ও প্রকৃতি স্বীকৃত ছিলো এই সময় পর্যন্ত, তার সম্বন্ধে দেখা দিলো সন্দেহ। এই সন্দেহের প্রেরণা পাওয়া গেলো এই সময়কার বিশেষ কতকগুলি গবেষণা ও আবিষ্কার থেকে। প্রথমতঃ, এই যুগে রসায়ন শাস্ত্রের আশ্চর্যরকম উন্নতি হয়েছিলো। ফলে অনেকেই তার আবিষ্কার ও যুক্তিতে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলেন। মনো-বিজ্ঞানীরাও বাদ যাননি এর প্রভাব থেকে। কাজেই রসায়ন শাস্ত্রের যুক্তি ও পদ্ধতি তাঁরা প্রয়োগ করলেন মনের ক্ষেত্রে। তাঁরা বললেন যে, রসায়ন শাস্ত্র যেমন প্রমাণ করেছে যে, প্রায় প্রত্যেকটি জড়বস্তুই কতকগুলি বিভিন্ন উপাদান সংযোগে গঠিত এক একটি যৌগিক পদার্থ ; এবং সেই বিভিন্ন উপাদানগুলিকে বিশ্লেষণ করলেই পদার্থটির সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানলাভ করা যেতে পারে, তেমনি মনের প্রতিটি বৃত্তি ও কার্যও গঠিত কতকগুলি উপাদান সংযোগে এবং মন সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করতে হলে আমাদের প্রধান কর্তব্য হবে সেই সেই যৌগিক বৃত্তিগুলিকে তাদের বিভিন্ন উপাদানে বিশ্লেষণ করা। দৃষ্টিভঙ্গির এই যে নতুন আদর্শ এরা নিয়ে এলেন, এর নাম দেওয়া হলো 'মানসিক-রসায়ন-আদর্শ' (mental

chemistry ideal)। দ্বিতীয়তঃ, এই যুগের মনোবিজ্ঞানের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিলো দেহ-বিজ্ঞান (physiology)। মন জিনিষটি যাই কিছু হোক না কেন, কোন একটি শরীর বা দেহকে বাদ দিয়ে সে থাকতে পারে না। এবং তার সমস্ত বৃত্তি ও কার্যকলাপও অভিব্যক্ত হয় সেই শারীরিক আচরণের মধ্য দিয়ে। কাজেই দেহবিজ্ঞানের সঙ্গে মনো-বিজ্ঞানের ঘনিষ্ঠ যোগ থাকবে, এটা খুবই স্বাভাবিক। এবং প্রথম দিকে মনোবিজ্ঞানের আলোচনা গড়ে উঠ্‌বে শরীর-বিজ্ঞানকে অবলম্বন করে এটাও স্বাভাবিক। আর, প্রকৃত পক্ষে হয়েও ছিলো তাই। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে শরীর-বিজ্ঞানীদের নানা প্রকার পরীক্ষাদি থেকে চমৎকার ফল পাওয়া গেলো, এবং তার প্রভাব মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিস্তৃত হতে বিশেষ দেরী হলো না। ফলে শরীর-বিজ্ঞানের পরীক্ষাগারে আরম্ভ হলো মনোবিজ্ঞানের পরীক্ষা। এবং শেষ পর্যন্ত ১৮৭৯ সালে ভূণ্ট (Wundt) লাইপজিগে স্থাপন করলেন সর্ব প্রথম মনোবিজ্ঞানের নিজস্ব পরীক্ষাগার। এর অল্প কিছুদিন পরেই দেখা দিলো আরও কয়েকটি পরীক্ষাগার। এই সমস্ত পরীক্ষাগারে যে মনোবিজ্ঞান গড়ে উঠ্‌লো, তার নাম দেওয়া হলো নব-মনোবিজ্ঞান ; এবং এর বৈশিষ্ট্য হলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা। তৃতীয়তঃ, এই সময়ে আর একটি বিজ্ঞান বেশ উন্নতি করছিলো। সে হচ্ছে সাধারণ প্রাণ-বিজ্ঞান (Biology), এবং ক্রমবিকাশবাদ। এদিকেও দৃষ্টি দিলেন

মনোবিজ্ঞানীরা। ক্রমবিকাশবাদ বললো যে, যে-কোন প্রাণীর যে-কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও কার্যকলাপের মূলে হচ্ছে বিশেষ এক পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াবার প্রচেষ্টা। বিশেষ এক পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াবার প্রয়োজনে আমাদের মধ্যে দেখা দিয়েছে বিশেষ বিশেষ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও কার্যকলাপ; এবং তারাই শেষ পর্যন্ত টিঁকে থেকেছে। আর যে সমস্ত জিনিষ, পরিবর্তিত পরিবেশের পক্ষে অপ্রয়োজনীয়, তারা ক্রমে ক্রমে লুপ্ত হয়ে গেছে। প্রাণবিজ্ঞানের এই সিদ্ধান্ত নিয়ে মনোবিজ্ঞানীরা বললেন যে মন ও তার বিভিন্ন অভি-ব্যক্তিকেও বিচার করতে হবে এই দিক থেকে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়ার তাগিদ থেকেই উদ্ভূত হয়েছে বিভিন্ন মনোবৃত্তি। অর্থাৎ এই সময় থেকে মনোবিজ্ঞান দৃষ্টি দিলো মানুষের বংশানুক্রমিতা ও পরিবেশের দিকে। কিন্তু শুধুমাত্র বংশানুক্রমিতা ও পরিবেশ নিয়েই চললো না। ক্রমবিকাশ যদি মানতে হয়, এবং যদি বলা যায় যে, মনের বিভিন্ন বৃত্তি ইত্যাদি ক্রমবিকাশেরই ফল, তাহলে ব্যক্তিগত মানুষের ও সমগ্রভাবে মানবজাতির অতীত জীবন পর্যালোচনা করাও বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়ে। অর্থাৎ এদিক থেকে মনোবিজ্ঞান এসে দাঁড়ালো নৃতত্ত্বের (Anthropology) কাছাকাছি। চতুর্থতঃ, উনবিংশ শতাব্দীর আগে, নানাপ্রকার মানসিক বিকার ইত্যাদির চিকিৎসার জন্য নির্দিষ্ট কোন পদ্ধতি ছিলো না বললেই হয়। উনবিংশ শতাব্দীর

চিকিৎসকেরা দৃষ্টি দিলেন এদিকে। ফলে আবিষ্কৃত হলো আর একটি সত্য। বিভিন্ন পরীক্ষা ও গবেষণায় প্রমাণিত হলো যে, মনোবিজ্ঞানের আলোচনা করতে গিয়ে শুধুমাত্র সুস্থ ও স্বাভাবিক মানুষের মন ও তার কার্যাবলী পর্যবেক্ষণ করলেই সে সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান পাওয়া যাবে না। মনের নানা প্রকার অসুস্থতা, বিকার ও তাদের কার্যকারণ নীতি এবং বৈশিষ্ট্যকেও জানা মনোবিজ্ঞানীর পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক।

এইভাবে নানাদিক থেকে প্রভাবান্বিত হয়ে এই সময়ের মনোবিজ্ঞান এমন একটা অবস্থায় এসে পৌঁছলো যখন আর তাকে দর্শন শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করে রাখা সম্ভব হলোনা। ফলে মনোবিজ্ঞান বিচ্ছিন্ন হয়ে এলো দর্শন শাস্ত্র থেকে। বলা যেতে পারে, এই সময় থেকে মনোবিজ্ঞানকে দেওয়া হলো প্রাপ্তবয়স্কের অধিকার ও স্বীকৃতি। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য লাভ করে মনোবিজ্ঞান ঘোষণা করলো যে তার বিষয়বস্তু হচ্ছে চেতনা। অনুভূতি, আকাঙ্ক্ষা, জ্ঞান, সংবেদন, প্রত্যয় ইত্যাদি সবই হচ্ছে চেতনার অভিব্যক্তি। কাজেই এরাই হলো মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়বস্তু। এক কথায়, চেতনা ও তার বিভিন্ন অভিব্যক্তিকে নিয়ে যে মনোজগত তারই অধ্যয়ন হলো এই সময়কার মনোবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। এবং এর জন্য পদ্ধতি হিসেবে নেওয়া হলো অন্তর্নিরীক্ষণ (Intrsopection)।

উনবিংশ শতাব্দীর এই পটভূমি থেকে দেখা দিলো বিংশ শতাব্দীর মনোবিজ্ঞান। কিন্তু এই আবির্ভাব হলো প্রধানতঃই

আক্রমণাত্মক'। অর্থাৎ যে মনোবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা হয়েছিলো ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে, বিংশ শতাব্দীতে এসে তারই বিরুদ্ধে দেখা দিলো সন্দেহ ও বিদ্রোহ। এই সন্দেহ ও বিদ্রোহ এলো নানা দিক থেকে। অনেকেই ঘোষণা করলেন যে প্রচলিত মনোবিজ্ঞানের যে সমস্ত স্বীকৃতি, তাদের মেনে নিতে তাঁরা প্রস্তুত নন। কেননা, সে সমস্ত তাঁদের মতে ভুল, অসম্পূর্ণ ও অবৈজ্ঞানিক। কাজেই শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন সন্দেহ-কারী ও বিদ্রোহীদলকে কেন্দ্র করে, তাঁদের সন্দেহ ও বিদ্রোহের মাঝ দিয়ে গড়ে উঠ্‌লো মনোবিজ্ঞানের নতুন কয়েকটি শাখা। এই বিভিন্ন শাখাকেই বলা হয় সমসাময়িক মনোবিজ্ঞান। এদের সকলেরই আক্রমণের লক্ষ্য হচ্ছে গত যুগের মনোবিজ্ঞান। কিন্তু পদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গি একের অন্যের থেকে পৃথক। প্রথমতঃ, এদের অনেকেই বললো যে, গত যুগে মনোবিজ্ঞানের যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে সেই সংজ্ঞাটাই ভুল। অর্থাৎ, চেতনা ও অভিব্যক্তি নিয়ে যে মনোরাজ্য, শুধুমাত্র সেইটেই মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু নয়। তাহলে কী তার বিষয়বস্তু? এর উত্তরে এক দল বললেন যে, মনকে শুধুমাত্র চেতনার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলেই চলবেনা। চেতনার বাইরে আরও গভীরে অচেতনার মধ্যে তাকে প্রসারিত করতে হবে। মনোবিজ্ঞান মনেরই বিজ্ঞান; আর মনের পরিধি হচ্ছে চেতনা ও অচেতনা নিয়ে। এঁরা হলেন মনঃসমীক্ষক। প্রধানতঃ মনের অচেতন অংশ, তার প্রকৃতি ও কার্যপ্রণালী, এবং সেই অংশের বিভিন্ন গুপ্ত কামনা

বাসনা ইত্যাদি নিয়ে গড়ে উঠ্‌লো এই মনোবিজ্ঞান। আবার আর এক সম্প্রদায় বললেন যে, চেতনা বা মনের কোন প্রয়োজনই নেই মনোবিজ্ঞানে। কেননা ও জিনিষটা আমাদের ধরা ছোঁয়ার বাইরে। যা আমরা জানি ও পরীক্ষা করতে পারি সে হচ্ছে শারীরিক আচরণ। মন বা চেতনা নামে যদি কোন বস্তু থাকেও তবে শারীরিক আচরণ ভিন্ন তার অভিব্যক্তির অন্য কোন পথ নেই। কাজেই কোন্ অবস্থায়, কীভাবে, আমাদের কোন আচরণ দেখা দেয়, ও তার বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা—এই হচ্ছে মনোবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। এ'রা হলেন আচরণবাদী। মনঃসমীক্ষকেরা প্রকৃতপক্ষে চেতনাকে বাদ দিলেন, কিন্তু গ্রহণ করলেন অচেতনা। আচরণবাদীরা চেতনাকে তো বাদ দিলেনই, সঙ্গে সঙ্গে অস্বীকার করলেন অচেতনাকেও। এই মনঃ সমীক্ষণ ও আচরণবাদ ছাড়াও সমসাময়িক মনোবিজ্ঞানের আরও কয়েকটি শাখা রয়েছে। যেমন ম্যাক্‌ডুগালের এষণাবাদ; জার্মানীর সমগ্রতাবাদ। মনঃসমীক্ষণের সঙ্গে অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য থাক্‌লেও ম্যাক্‌ডুগালের এষণাবাদ গড়ে উঠ্‌লো সমাজবিজ্ঞানের চিন্তা থেকে, এবং এর প্রতিবাদ এলো প্রচলিত মনোবিজ্ঞানের পদ্ধতির বিরুদ্ধে। যে কোন প্রাণীর আচরণের মূলভিত্তি হিসেবে ম্যাক্‌ডুগাল স্বীকার করে নিলেন কতকগুলি সহজ প্রবৃত্তি, এবং সেই প্রবৃত্তিগুলির বিশ্লেষণ ও আলোচনাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠ্‌ল তাঁর মনোবিজ্ঞান। অন্যদিকে জার্মানীর

সমগ্রতাবাদ এলো উনবিংশ শতাব্দীর মনোবিজ্ঞানের সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ নিয়ে। এখানে বলা হলো যে, কোন মনোবৃত্তি, অভিজ্ঞতা বা আচরণকে তার বিভিন্ন উপাদানে বিশ্লেষণ করার যে আদর্শ, তা ব্যর্থ। কোন যথার্থ জ্ঞানই আমরা পেতে পারিনা ও ভাবে। কেননা, যেসমস্ত উপাদান নিয়ে কোন একটি মনোবৃত্তি, অভিজ্ঞতা বা আচরণ গড়ে উঠেছে, সেই সমস্ত উপাদানের বাইরে অতিরিক্ত আর একটি নিজস্ব রূপ ও তাৎপর্য—সেই মনোবৃত্তি, অভিজ্ঞতা বা আচরণের আছে। সেই সমগ্র রূপটিই মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু।

এই হলো সংক্ষেপে সমসাময়িক মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা। এ বাদে মনঃসমীক্ষণের মধ্যেই আবার দেখা দিয়েছে আরও দু'একটি স্বতন্ত্র সম্প্রদায়। তাদের মধ্যে ইয়ুং (Jung) ও এ্যাড্‌লার (Adler)ই বোধহয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পরবর্তী অধ্যায় থেকে আমরা একে একে এঁদের সকলের মতবাদ সম্পর্কে আলোচনা করবো।

মনঃসমীক্ষণ

আধুনিক মনোবিজ্ঞানের অন্যতম ও সর্বপ্রধান শাখা হচ্ছে সিগ্‌মুণ্ড ফ্রয়েড (Sigmund Freud) প্রবর্তিত মনঃসমীক্ষণ (Psycho-analysis)। এই মনঃসমীক্ষণকে ভালো করে বুঝতে হলে এর ইতিহাস অনুধাবন করা বিশেষ আবশ্যক। কেননা, মনঃ সমীক্ষণ হঠাৎ এক দিনের নির্দিষ্ট কোন জিনিষ নয়। বহুদিনের অক্লান্ত গবেষণা ও পরিশ্রমের ফলে বহু পরিবর্তন ও সংশোধনের মাঝ দিয়ে ক্রমবিকশিত হয়ে হয়ে আজ সে একটা নির্দিষ্ট রূপ নিতে সমর্থ হয়েছে। এই ক্রমবিকাশের ইতিহাস যেমন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি চিত্তাকর্ষক। সেই ইতিহাস যদি আমরা লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পাবো যে, মনঃ সমীক্ষণের উৎপত্তি হয়েছিলো চিকিৎসার ক্ষেত্রে ; এবং এর প্রবর্তক সিগমুণ্ড ফ্রয়েড নিজেই ছিলেন একজন চিকিৎসক। ১৮৫৬ সালে চেকোশ্লোভাকিয়ায় ফ্রয়েডের জন্ম হয়। কিন্তু অতি ছোট বেলা থেকেই তিনি থাকতেন ভিয়েনা সহরে। বিশ্ব -বিদ্যালয়ে তাঁর প্রধান পাঠ্যবিষয় ছিলো চিকিৎসাশাস্ত্র, বিশেষ করে স্নায়ুতন্ত্র সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান (Neurology)। বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে যখন তিনি স্বাধীন ভাবে চিকিৎসা আরম্ভ করলেন ভিয়েনায়, তখন জোসেফ ব্রয়ের (Joseph

Breuer) নামে এক ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মে। ব্রয়ের, হিষ্টিরিয়া ও অন্যান্য কতকগুলি রোগের চিকিৎসা নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। কেননা, তখনকার সময়ে হিষ্টিরিয়া রোগের চিকিৎসার জন্য কোন ব্যবস্থা ছিলোনা বললেই হয়। শার্কো (Charco) নামে একজন ফরাসী চিকিৎসক একাই যা হোক কিছু অভিজ্ঞতা এবিষয়ে সঞ্চয় করেছিলেন। তার ফলে শার্কো হিষ্টিরিয়া রোগের চিকিৎসার জন্য উপায় হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন সম্মোহন (hypnosis)। চিকিৎসা ক্ষেত্রে নেমে ফ্রয়েডকে কতকগুলি হিষ্টিরিয়া রোগীর সম্মুখীন হতে হলো; এবং এদের চিকিৎসার অন্য কোন উপায় জানা না থাকায়, তিনিও প্রথমে অবলম্বন করলেন শার্কো প্রদর্শিত সম্মোহন পদ্ধতি। কেবলমাত্র স্নায়ুতন্ত্র ঘটিত কোন বিশৃঙ্খলার ফলে যে হিষ্টিরিয়া দেখা যেতো, প্রথমদিকে ফ্রয়েড দৃষ্টি দিলেন শুধুমাত্র সেই দিকে। এমন সময়ে ১৮৮০ সালে এমন একটি হিষ্টিরিয়া রোগীর সম্মুখীন তাকে হতে হলো যাতে ফ্রয়েডের মনে জেগে উঠলো নতুন প্রশ্ন ও সন্দেহ। এবং এই প্রশ্নের উত্তর থেকে দেখা দিলো অভিনব সম্ভাবনা। ঘটনাটা এই, একুশ বছরের একটি মেয়ে কিছুতেই কোন গ্লাস থেকে জল খেতে পারতোনা। এবিষয়ে তার ছিলো অস্বাভাবিক বিতৃষ্ণা। কেন যে এ বিতৃষ্ণা তা কিন্তু মেয়েটি নিজেই জানতো না। অবশেষে একদিন তাকে চিকিৎসার জন্য প্রয়োগ করা হলো সম্মোহন; এবং সম্মোহিত অবস্থায় সে এমন কতকগুলি কথা

বললো যার থেকে তার ঐ বিতৃষ্ণার কারণ জানতে আর বাকি রইলোনা। কিছুদিন আগে একদিন মেয়েটি এক ভদ্র লোকের বাড়ি গিয়েছিলো। সেখানে সে সেই ভদ্রলোকটির একটি পোষা কুকুরকে একটি গ্লাস থেকে জল খেতে দেখেছিলো। দৃশ্যটি তার কাছে অত্যন্ত বিচ্ছিরি বোধ হয়েছিলো। কিন্তু ভদ্রতার খাতিরে সেই বিরক্তিকে সে বাধ্য হয়ে চেপে রেখেছিলো। ফলে সেই অবদমিত বিরক্তিটি ধীরে ধীরে তার নির্জ্ঞান (unconscious) মনে আশ্রয় নিয়েছিলো,এবং এই ঘটনাটির কথা সে একেবারেই ভুলে গেলো। গ্লাস থেকে জল খাওয়ার প্রতি যে বিতৃষ্ণা সেটা মেয়েটির দৈনন্দিন জীবনের ব্যাপার এবং তার পিছনে যে কারণটি বর্তমান, তাও সাধারণ জীবনেরই একটি ঘটনা, কিন্তু মেয়েটি তা ভুলে গেছে। ফ্রয়েডের কাছে এ ব্যাপারটা অত্যন্ত অর্থপূর্ণ মনে হলো। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের কোন আচরণের কারণ যদি হয় এমন কোন ঘটনা যা আমরা সম্পূর্ণ ভুলে গেছি তাহলে বলতে পারা যায় যে, বিস্মৃত অনুভূতিও হয়তো আমাদের দৈনন্দিন জীবনে একেবারে অপ্রয়োজনীয় নয়। এই সম্ভাবনার আভাস পাবার পর ১৮৮৫ সালে ফ্রয়েড চলে এলেন প্যারিসে। উদ্দেশ্য ছিলো শার্কোর কাছ থেকে এবিষয়ে আরও কিছু অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। হিষ্টিরিয়া রোগীর চিকিৎসায় শার্কোর ব্যবহৃত পদ্ধতি দেখে ফ্রয়েড অত্যন্ত অভিভূত হয়ে পড়লেন। শার্কো প্রায়ই বলতেন যে, যদি গভীরভাবে

বিশ্লেষণ করে দেখা যায় তাহলে স্নায়ুতন্ত্র ঘটিত প্রত্যেকটি রোগের মধ্যেই রোগীর যৌন জীবন সংক্রান্ত কোন না কোন গোলযোগ নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। গুরুর এই মন্তব্য ফ্রয়েড বিশেষ অর্থপূর্ণ মনে করলেন। তিনি ভাবলেন যদি একথা সত্য হয় তবে শার্কো তাঁর নিজের চিকিৎসার ক্ষেত্রে কেন এই ধারণাকে কাজে লাগাচ্ছেন না। কিন্তু এ প্রশ্ন তিনি ব্যক্ত করলেন না; এবং এই প্রশ্নটিকে নিয়েই তিনি ১৮৮৬ সালে ফিরে এলেন ভিয়েনায়। এইবার ফ্রয়েডের সঙ্গে ব্রয়েরের ঘনিষ্ঠতা আরও নিবিড় হয়ে উঠলো, এবং তুজনে মিলে স্নায়বিক বিকারের গবেষণায় প্রবৃত্ত হলেন। ব্রয়ের এই সময়ে নতুন একটি পদ্ধতি নিয়ে পরীক্ষা করছিলেন। একটি মহিলাকে চিকিৎসা করার সময়ে হঠাৎ একদিন দেখা গেলো যে সম্মোহিত অবস্থায় সেই মহিলাটিকে যদি তার নিজের সম্বন্ধে কথা বলার যথেষ্ট সুযোগ দেওয়া হয়, তাহলে সম্মোহনের পর তিনি অনেক সুস্থ ও আরাম বোধ করেন। সুতরাং ব্রয়ের ও ফ্রয়েড তাঁদের সম্মোহনের সঙ্গে যোগ করলেন এই 'কথাবলা' পদ্ধতি। ১৮৯৩ ও ১৮৯৫ সালে প্রকাশিত হলো তাঁদের বিবরণী; এবং তাঁদের ব্যবহৃত পদ্ধতির নাম দিলেন 'মানসিক বিরেচন' (mental catharsis)। কিছুদিন পরে দেখা গেলো যে, এই পদ্ধতিতে বিপদ নেহাৎ কম নয়। যে সমস্ত রোগী স্ত্রীলোক, তাদের মধ্যে ২।১ জনের মনে চিকিৎসকের প্রতি অনুরাগ দেখা দিতে আরম্ভ করলো। তাই শেষ পর্যন্ত ব্রয়ের এপথ

ছেড়ে দিলেন, ও ফ্রয়েড একাই সব দায়িত্ব নিয়ে কাজ চালাতে থাকলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনিও পদ্ধতিকে বাদ দিয়ে দিলেন তাঁর চিকিৎসা থেকে। এবার তাঁর পদ্ধতি হলো 'অবাধ ভাবানুষঙ্গ পদ্ধতি' (method of free association)। এই পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য দু'টি। প্রথমতঃ, রোগীকে অত্যন্ত সহজ ভাবে সমস্ত প্রত্যঙ্গ ও মন শিথিল করে আসন নিতে হবে; দ্বিতীয়তঃ, এই অবস্থায় তার মনে যেকোন ভাব বা চিন্তা আসে বিনা বিচারে নিঃসঙ্কোচে তা' বলে যেতে হবে। সম্মোহনের পরিবর্তে এই হলো ফ্রয়েডের নতুন পদ্ধতি। এই পদ্ধতি নিয়ে কাজ করতে করতে ফ্রয়েডের দৃষ্টি অধিকতর আকৃষ্ট হলো রোগীর নির্জ্ঞান মনের দিকে। কী করে সেখানে প্রবেশ করা যেতে পারে, এই হলো তাঁর চিন্তা। ফলে দেখা দিলো স্বপ্ন বিশ্লেষণ; ফ্রয়েড দেখলেন যে, রোগী তার গত রাতের স্বপ্ন মনে করতে পারে, এবং সেই স্বপ্নের বিভিন্ন অংশকে নিয়ে যদি অবাধ ভাবানুষঙ্গ পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায় তবে হয়তো রোগীর অন্তর্নিহিত কোন মানসকূট (complex) সম্বন্ধে জানা যেতে পারে। কাজেই তিনি মন দিলেন স্বপ্ন বিশ্লেষণের দিকে। এবং তাঁর অক্লান্ত গবেষণা ও পরীক্ষাদির ফলে ১৯০০ সালে প্রকাশিত হলো তাঁর 'স্বপ্নবিশ্লেষণ' (Interpretation of Dream) গ্রন্থ।

এতোক্ষণ পর্যন্ত আমরা যা দেখালাম, সে হচ্ছে চিকিৎসা ক্ষেত্রে ফ্রয়েড কীভাবে অগ্রসর হচ্ছিলেন তারই সংক্ষিপ্ত

ইতিহাস। ফ্রয়েডের মনোবিজ্ঞান জানতে হলে এ ইতিহাস অপরিহার্য। কেননা, তিনি প্রধানতঃই চিকিৎসক, এবং চিকিৎসা পদ্ধতির গবেষণার ফলেই পাওয়া গিয়েছিলো তাঁর মনোবৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত। স্নায়বিক বিকারের উৎপত্তি ও তাৎপর্য নির্ধারণ করতে গিয়ে তিনি অবিষ্কার করলেন যে, স্নায়বিক বিকার শুধুমাত্র স্নায়ুঘটিত বিশৃঙ্খলার জন্যই নয়, বিশেষ একটি মনোবৈজ্ঞানিক অর্থ ও উদ্দেশ্য তার আছে। কিন্তু সেই অর্থ ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে রোগী নিজেই কিছু জানে না। তিনি আরও দেখলেন যে, সেই অজ্ঞাত অর্থ যখন উপযুক্ত কোন উপায় দ্বারা রোগীর সামনে প্রকাশিত করা যায়, তখন সেই অভাবনীয় বস্তু রোগীর কাছে যে শুধুমাত্র বিস্ময়কর তাই নয়, অত্যন্ত আপত্তিকরও। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই অন্তর্নিহিত মনোভাবটি যখন রোগীর সজ্ঞান (conscious) মনে প্রকাশিত করা যায়, তখন তার রোগটিও সেরে যায়। এই যে অজ্ঞাত মনোবৃত্তি, একে বিশ্লেষণ করে ফ্রয়েড দেখলেন যে, সে অত্যন্ত অপরিণত—প্রায় শিশু ও আদিম জাতির মনের সমতুল্য। এ যে একমাত্র স্নায়বিক বিকারের ক্ষেত্রেই সত্য তা নয়, মনের অন্যান্য অভিব্যক্তি, যেমন স্বপ্ন, দৈনন্দিন ভুলভ্রান্তি, কৌতুক, লোকগাথা, পুরাণকাহিনী, কাব্য ইত্যাদি বিশ্লেষণ করে সেখানেও ঠিক একই বৈশিষ্ট্য দেখা গেলো। স্নায়বিক বিকারের সঙ্গে মৌলিক উপাদানগত কোন পার্থক্যই সেখানে নেই। এইভাবে চিকিৎসা শাস্ত্র থেকে জন্ম নিয়ে ফ্রয়েডের

চিন্তাধারা ছড়িয়ে পড়লো সমস্ত মনের উপর, বিশেষতঃ নির্জ্ঞান ও তার কার্যকলাপের উপর। এবং তারই থেকে গড়ে উঠল ফ্রয়েডের মনোবিজ্ঞান, যার নাম হচ্ছে মনঃসমীক্ষণ।

ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণকে আমাদের বিচারের সুবিধার জন্য দুভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম, তত্ত্বগত সিদ্ধান্ত; ও দ্বিতীয়, সেই সিদ্ধান্তকে জীবনের কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছে তার আলোচনা। তত্ত্বগত সিদ্ধান্তের দিক থেকে যে বিষয়টি সর্বপ্রথমে উল্লেখ করা প্রয়োজন সে হচ্ছে: মানুষের কোন মনোবৃত্তিই বিচ্ছিন্ন বা আকস্মিক নয়। প্রাকৃতিক ঘটনার মতো সকলেই তারা পূর্বাপরসম্বন্ধ যুক্ত। দৈনন্দিন জীবনে আমাদের যে আচরণ ভুলভ্রান্তি, বিস্মৃতি, কৌতুক অথবা বিকার-অবস্থায় যে অস্বাভাবিকতা—তাদের সকলেই এক নির্দিষ্ট কার্যকারণ সম্বন্ধ-দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। অর্থাৎ প্রকৃতির রাজ্যে যেমন বিনা কারণে কোন কিছু ঘটে না, তেমনই মানুষের প্রত্যেকটি আচরণের পিছনে একটি কারণ আছে এবং কারণটি উদ্দেশ্যমূলক। দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ আচরণ ও কাজকর্ম ইত্যাদি অপেক্ষাকৃত সহজবোধ্য; এবং তাদের পিছনে যে একটা উদ্দেশ্য থাকতে পারে, এ আমরা সহজেই স্বীকার করবো। কিন্তু অন্যান্য যে সমস্ত আচরণ জটিল—যেমন নানাপ্রকার ভুল ভ্রান্তি, স্বপ্ন, মানসিক রোগও যে উদ্দেশ্যমূলক হতে পারে, একথা আমরা সহজে মানতে চাইবো না। কিন্তু ফ্রয়েড দেখলেন যে বাস্তবিকই তারা

উদ্দেশ্যমূলক। তবে সে উদ্দেশ্য সব সময়ে আমাদের সংজ্ঞান মনে থাকে না। তাই তাকে আমরা চিনি না ও স্বীকার করতে চাই না। শুধুমাত্র, বিশ্লেষণ করলেই এর সত্যতা বোঝা যাবে। বিশ্লেষণ করলে সব সময়েই দেখা যাবে যে উদ্দেশ্যটি হচ্চে মনের কোন একটি গোপন কামনার পরিতৃপ্তি। দ্বিতীয়তঃ, এই যে বাসনা যার চরিতার্থতাই হচ্ছে সমস্ত আচরণ ব্যবহারের মূল কথা, তা কিন্তু বর্তমান পরিণত জীবনের বাসনা নয়। সে হচ্ছে মানুষের শিশুকালের কোন বাসনার অভিব্যক্তি। ফ্রয়েড মনে করেন যে, শিশুকালের যে মনোবৃত্তি, বিশেষত কামনা বাসনা ইত্যাদি, তারাই হচ্ছে পরিণত জীবনের সমস্ত মনোভাব, আচরণ ইত্যাদির ভিত্তি। পরবর্তী জীবনের যা কামনা অভিপ্রায়, তা শিশুকালের মনোভাব বা অভিপ্রায়ের সঙ্গে যুক্ত হতে পারলেই অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে। কাজেই বলা যেতে পারে যে, মানুষের মনোজীবন একটি নিরবচ্ছিন্ন একক পারম্পর্য। শৈশব থেকে নিয়ে পরিণত বয়স পর্যন্ত পরপর একটি পরম্পরাগত ঐক্য এর মধ্যে আছে। মাঝে মাঝে এই ঐক্যের মধ্যে অস্বাভাবিক আকস্মিক বিচ্ছেদ দেখা দেয় সত্য, কিন্তু অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে, মনের প্রত্যেকটী ঘটনার পিছনে যথেষ্ট কারণ রয়েছে। এবং যাকে আমরা বলছি অস্বাভাবিক ও আকস্মিক, তা' কারণহীন আকস্মিক নয়। তারও পিছনে নিহিত রয়েছে কোন বিশেষ কারণ। সেই কারণটিকে সাধারণতঃ আমরা সংজ্ঞান মনে খুঁজে পাই না। এ রকম ক্ষেত্রে

দেখা যাবে যে কারণটি নিহিত রয়েছে মনের কোন নির্জ্ঞান অংশে যাকে আমরা সচরাচর দেখতে পাই না। যেমন, এক যুবকের হয়তো বিশেষ কোন একটি বিষয়ে, যেমন সাহিত্যে বিশেষ উৎসাহ ও প্রেরণা দেখা গেলো। এর আগে সাহিত্যে তার বিশেষ উৎসাহ বা ঝোঁক দেখা যায়নি। কিন্তু এখন থেকে সে এ দিকে এতো বেশী ঝুঁকে পড়লো যে, সাহিত্যকেই সে গ্রহণ করে নিলো তার পেশা হিসেবে। ফ্রয়েডের মতে এরকম আচরণেরও যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে। এবং সে কারণ, পাওয়া যাবে না তার বর্তমান পারিপার্শ্বিকের মধ্যে। যুবকটি যে সাহিত্যকেই বেছে নিয়েছে তার কারণ, তার এই সাহিত্যিক জীবনের সঙ্গে তার গভীর নির্জ্ঞান-অন্তর্গত কোন শিশুকালের মনোভাব বা বাসনার ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। তা যদি না থাকতো তবে এ পথ সে বেছে নিতো না। অর্থাৎ আমাদের জীবনের সমস্ত কর্ম আচরণের ভিত্তি হলো শৈশব জীবনের মনোবৃত্তি ও কামনা। কিন্তু যেহেতু আমরা নিজেরাই আমাদের শিশুকালের কথা মনে করতে পারি না, ও অন্যের মধ্যেও তা থাকে নির্জ্ঞান স্তরে, তাই তার যথাযোগ্য গুরুত্ব আমরা উপলব্ধি করতে পারি না। শৈশব জীবনের মনোভাব যে আমরা ভুলে যাই, তার মধ্যেও একটি বৈশিষ্ট্য আছে। আমরা যে শুধু ভুলেই যাই তাই নয়. সেই বিস্মৃতির সময়ে রীতিমতো এক নির্বাচন চলে আমাদের শিশু মনের মধ্যে। যে সমস্ত বিষয়ের কোন অর্থ বা তাৎপর্য বিশেষ নেই, তারাই

মনে থেকে যায়, আর গভীর অর্থপূর্ণ ও গুরুতর বিষয়গুলি আমরা ভুলে যাই। এই যে বিস্মৃতি এর কারণ কী? তার উত্তরও ফ্রয়েড দিয়েছেন। মানসিক বৃত্তির অবদমনই হচ্ছে এই বিস্মৃতির কারণ। শিশু যখন জন্ম নেয়, তখন তার মনের মধ্যে থাকে কতকগুলি সহজাত প্রবৃত্তি ও কামনা। শিশুর পক্ষে হয়তো সেগুলি বিশেষ দোষের নয়; কিন্তু পরিণত বয়সের মানুষের পক্ষে ও সমাজ জীবনে তারা আপত্তিকর। সমাজ তাদের গ্রহণ করতে পারে না। সুতরাং আমাদের বাল্যকালের শিক্ষার প্রধান কাজই হচ্ছে সেই সমস্ত আপত্তিকর প্রবৃত্তি ও কামনাগুলি থেকে মুক্ত করে শিশুমনকে অন্য কোন অভিপ্রেত অভিমুখে পরিচালনা করা। ফ্রয়েড এই পদ্ধতির নাম দিয়েছেন 'উদ্‌গতি' (sublimation) এই আদিম প্রবৃত্তিগুলি—যেমন সম্পূর্ণ আত্মসুখ ও ভোগের দিকে লক্ষ্য ইত্যাদি—এরা আত্মপ্রকাশ করে কতকগুলি দৈহিক ক্রিয়াকলাপের মধ্য দিয়ে। কাজেই সেই দৈহিক অভিব্যক্তিগুলিকে অবদমিত করা হয়, ও সঙ্গে সঙ্গে তাদের মূলগত মানসিক প্রবৃত্তিগুলির আত্মপ্রকাশের পথ বন্ধ হয়ে যায়। ফলে তারা নিমজ্জিত হয়ে যায় নির্জ্ঞানের অন্ধকারে।

উপরে আমরা 'অবদমন' ও অবদমিত শব্দের উল্লেখ করেছি। এই অবদমন থেকেই এসে পড়ে মনঃসমীক্ষণের একটি অন্যতম প্রধান সিদ্ধান্ত। সে সিদ্ধান্তের মূল কথা হচ্ছে এই যে, মানুষের মন শুধু মাত্র দর্শক বা জ্ঞাতা নয়;

অত্যন্ত সক্রিয় তার চরিত্র। এবং বিশেষ একটি গতি-ধর্ম আছে তার। এই কথাটা বুঝতে হলে মনের সম্বন্ধে সাধারণ দু'একটা কথা বলা আবশ্যক। মন অনেকটা একটা যন্ত্রের মতো। এর একদিকে রয়েছে বহিরাগত নানাবিধ সংবেদনা প্রত্যয় ইত্যাদিকে গ্রহণ করার বন্দোবস্ত, আর অন্যদিকে রয়েছে সেই সংবেদন ইত্যাদি থেকে যে মানসিক শক্তি সৃষ্টি হচ্ছে তাকে মনের ভিতর থেকে নিয়ে বাইরের দিকে মুক্ত করে দেবার উপায়। এই মানসিক শক্তি যদি কোন কারণে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে না পারে, তাহলে মনের মধ্যে জমে ওঠে একপ্রকার পীড়ন বা যন্ত্রণা বোধ (tension)। প্রত্যেক মনো-বৃত্তির মৌলিক নীতিই হচ্ছে এই পীড়ন থেকে মুক্ত হয়ে সুখ বোধ করা এবং কোন কারণে যাতে পীড়ন জমে উঠ্‌তে না পারে তার চেষ্টা করা। কিন্তু যদি কোন কারণে একটি মনোবৃত্তি নিজেকে চরিতার্থ করতে না পারে, তাহলে মনের মধ্যে দেখা দেয় এক দ্বন্দ্ব। সে দ্বন্দ্ব অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক ও কষ্টকর। কাজেই এই যন্ত্রণার হাত থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য সেই অকৃতার্থ মনোবৃত্তিকে সংজ্ঞান থেকে সরিয়ে দিয়ে মানুষ কতকটা মুক্ত ও নিশ্চিন্ত হতে চায়। মনের সংজ্ঞান স্তর থেকে এই ভাবে কোন বৃত্তি বা কামনাকে যখন জোর করে সরিয়ে নির্জ্ঞানের মধ্যে বিসর্জন দেওয়া হয়, মনঃসমীক্ষণে তাকেই বলে অবদমন (Repression) ; আর এই অবদমন হচ্ছে একাধিক মানসিক বৃত্তির আত্মপ্রকাশের চেষ্টায়

পরস্পরের মধ্যে সংঘাতের ফল। এই সমগ্র ব্যাপারটাই ঘটে আমাদের অজ্ঞাতে। সে সম্বন্ধে আমরা মোটেই সচেতন থাকি না।

এতোক্ষণ পর্যন্ত যে আলোচনা আমরা করেছি, তার থেকে এইটুকু বোঝা যায় যে, ফ্রয়েডের মতে আমাদের সাধারণ আচরণ ব্যবহার ইত্যাদির মূল ভিত্তি হচ্ছে শৈশব-অবস্থার কতকগুলি অচরিতার্থ ও অবদমিত বাসনার বিভিন্ন অভিব্যক্তি মাত্র। কিন্তু কী সে বাসনা ?—বা কী তার স্বরূপ ?—এর উত্তরে ফ্রয়েড বললেন যে, আমাদের অধিকাংশ বাসনাই কামজ। সাধারণ প্রচলিত যে অর্থে আমরা 'কাম' বা 'কামজ' শব্দটি ব্যবহার করি, ফ্রয়েড 'কাম' শব্দটিকে ব্যবহার করলেন তার থেকে একটু বিস্তৃত অর্থে। সাধারণ প্রচলিত ও ফ্রয়েড ব্যবহৃত দুটি শব্দের অর্থই এক ও অভিন্ন। তবে ফ্রয়েড ব্যবহৃত শব্দটির পরিধি কিছু ব্যাপক। ফ্রয়েড বলেন যে, সাধারণতঃ যাকে আমরা বলি 'কাম', তার জন্ম বাস্তবিকই শিশুকালে ; কিন্তু তখন আমরা তাকে ঠিক বুঝতে পারি না ও লক্ষ্য করি না। অর্থাৎ পরিণত বয়সের যে কাম প্রবৃত্তি বা যৌন বোধ, তার জন্ম হচ্ছে শিশুকালে ; এবং সেখান থেকে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমবিকাশের বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে এসে আমাদের পরিচিত রূপ গ্রহণ করে। তখনই আমরা তাকে বলি কাম প্রবৃত্তি, বা যৌন-বোধ। শিশু জীবনে কাম ও পরিণত জীবনের কামের মধ্যে প্রায় কোন সাদৃশ্যই দেখা যাবে না। তবু তারা

একই। যে প্রেরণা কাজ করছে পরিণত বয়সের যৌন-অনুভূতির মূলে, সেই একই প্রেরণা কাজ করছে শিশুর সরল সুন্দর আচরণের মূলে। একই প্রেরণা নিজেকে প্রকাশ করছে বিভিন্ন রূপে। শিশুকাল থেকে নিয়ে পরিণত বয়স পর্যন্ত এই যে প্রেরণা বা প্রবৃত্তির ক্রমবিকাশ যার শেষ স্তরটিকে আমরা সাধারণ ভাষায় বলছি কাম, ফ্রয়েড সমগ্রভাবে তার নাম দিলেন 'লিবিডো' (libido) যার তাৎপর্যগত বাংলা প্রতিশব্দ হচ্ছে কামশক্তি বা কাম প্রবৃত্তি। ফ্রয়েডের মতে অন্যান্য যে কোন প্রবৃত্তির মতোই নিজেকে চরিতার্থ করে আনন্দ উপভোগ করাই হচ্ছে এই কাম প্রবৃত্তির লক্ষ্য। যৌন-মিলনকেই আমরা কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার উপায় বলে মনে করি। কিন্তু 'কাম' শব্দটিকে ফ্রয়েডের ব্যবহৃত ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করলে দেখা যাবে যে, এ ধারণা ভুল। কামপ্রবৃত্তির সঙ্গে জননেন্দ্রিয়ের সম্পর্ক যদিও অতি ঘনিষ্ঠ, তবু একেবারে অপরিহার্য সে নয়। বাস্তবিক পক্ষে শিশুকালে মানুষের এই প্রবৃত্তির সঙ্গে জননেন্দ্রিয়ের কোন সম্পর্কই থাকে না। সে সম্পর্ক দেখা দেয় অনেক পরে। এই দিক থেকে বিচার করে ফ্রয়েড এই কাম প্রবৃত্তির বিকাশের দুটি স্তর ঠিক করেছেন—প্রাক্-লৈঙ্গিক (pregenital) ও লৈঙ্গিক (genital)। প্রাক্-লৈঙ্গিক স্তরের যে কামনা তার সঙ্গে জননেন্দ্রিয়ের কোন যোগাযোগ নেই, এখানে সে ছড়িয়ে থাকে সমস্ত অঙ্গে। অর্থাৎ সমগ্র শরীরটাকেই এই স্তরে কাম প্রবৃত্তির উৎস বলে

ধরা যেতে পারে। কিন্তু তবু বলা যায় যে, শরীরের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হয়তো এদিক থেকে সমান সক্রিয় ও কার্যকরী নয়। এবং শিশু জীবনের একেবারে প্রথম অবস্থায় শরীরের যে অঙ্গটি অপেক্ষাকৃত বেশী সক্রিয়, সে হচ্ছে ঠোঁট বা মুখ। মুখই আনন্দ প্রদানের প্রথম প্রধান অঙ্গ, বা কামস্থান (erogenous zone)। নিতান্ত প্রাণধারণের জন্যই শিশুর পক্ষে মাতৃস্তন পান করা আবশ্যক। কাজেই স্তন পান করে প্রয়োজনের চরিতার্থতায় সে আনন্দ পায়। এই অবস্থায় মাতৃস্তন, ঠোঁট ও আনন্দের মধ্যে একটা যোগাযোগ স্থাপিত হয়ে যায়। ফলে, অল্প কিছুদিনের মধ্যেই দেখা যায় যে, বিনা প্রয়োজনেই শিশু শুধু মাত্র আনন্দ লাভের জন্যই মাতৃস্তন চুষতে থাকে। কামপ্রবৃত্তি বিকাশের এই অবস্থাটিকে ফ্রয়েড নাম দিয়েছেন anaclitic ; অর্থাৎ প্রাণধারণের উপায়ের সঙ্গে একীভূত। জননেন্দ্রিয়ের সঙ্গে কোন সম্পর্ক না রেখে বিশেষ কোন একটি মাত্র কাম স্থানই এর অবলম্বন ; এবং সেই বিশেষ কামস্থানটি এই স্তরে মুখ বা ঠোঁট ; সেইজন্য এর আর এক নাম 'মুখকাম' (oral phase) স্তর। এই অবস্থায় শিশু যে কোন জিনিষ সামনে পায় মুখে দিতে চেষ্টা করে। এই অবস্থারই একটু দীর্ঘস্থায়ী বিকৃত রূপ হচ্ছে আঙ্গুল চোষা। এই স্তরের পর 'পায়ু কাম' (anal phase) নামে আর একটি স্তর পার হয়ে শিশু এসে পৌঁছয় লৈঙ্গিক স্তরে। এই সময় থেকেই

দেখা দেয় জননেন্দ্রিয়ের প্রাধান্য। প্রাক্-লৈঙ্গিক স্তরের যে সমস্ত কাম-বাসনা বিভিন্ন কামস্থানকে কেন্দ্র করে স্বতন্ত্রভাবে নিজেকে চরিতার্থ করার চেষ্টা করে, লৈঙ্গিক স্তরে এসে তাদের মধ্যে দেখা দেয় সহযোগিতা। তাদের বাসনা তখন পরস্পর থেকে ভিন্ন নয়; তাদের পরস্পর বিচ্ছিন্ন কামনা ও আনন্দ তখন সমবেত হয়ে আশ্রয় করে জননেন্দ্রিয়কে। জননেন্দ্রিয়ের কামনা পূর্ণ করাই এই স্তরের প্রধান বৈশিষ্ট্য। বিভিন্ন কাম-স্থান থেকে আগত আনন্দ এই সময় হয়ে পড়ে গৌণ (fore-pleasure), এবং এদের চরম লক্ষ্য ও পরিণতি (end-pleasure) হচ্ছে জননেন্দ্রিয়ে।

যৌন-জীবনের বা কামপ্রবৃত্তির এই যে স্তর বিভাগ, এটা হলো, বিভিন্ন কামস্থানের সংস্থা অনুসারে। আবার অন্য দিক থেকেও বিষয়টিকে বিচার করা যেতে পারে। প্রত্যেক কামনার একটি বস্তু থাকে, যার থেকে চরিতার্থতার আনন্দ আসে। কাম-প্রবৃত্তি বিকাশের বিভিন্ন অবস্থায় এই বস্তুটি দেখা দেয় বিভিন্ন রূপ নিয়ে। এই দিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে যে, একেবারে গোড়ার দিকে নিতান্ত প্রাণধারণের জন্যই শিশুকে নির্ভর করতে হয় মাতৃস্তনের উপর। তাই এই সময়ে তার কামনার বস্তু হয় মাতৃবক্ষ। তারপর ধীরে ধীরে মাতৃবক্ষ থেকে সরে এসে শিশুর কামপ্রবৃত্তি স্থাপিত হয় নিজের দেহের উপর। এই সময়ে সে শুধু নিজেকেই ভালোবাসে, নিজেকে নিয়েই বিভোর হয়ে থাকে। এই অবস্থার নাম হচ্ছে

স্বকাম (narcissism), কিন্তু এ ভাবও বেশীদিন স্থায়ী হয় না। গতিশীল কামশক্তি নিজের দেহকে অতিক্রম করে নিজেকে স্থাপিত করতে চায় বাইরের কোন বস্তুর উপর। এই সময়ে শিশু-জীবনে তার বিভিন্ন কামস্থানগুলিও অনেকটা সংহত হয়ে এসেছে। এখন তারা আর স্বতন্ত্র ও পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয়। কাজেই যে বস্তু এই সময়ে তার লক্ষ্য সে কোন মানুষের বিশেষ কোন অঙ্গ নয়, সম্পূর্ণ মানুষটিই এখন তার কামনার বস্তু। এবং সেই সম্পূর্ণ মানুষটি শিশুজীবনে ছেলেদের পক্ষে সাধারণতঃই তার মা। কিন্তু মায়ের প্রতি তার যে আসক্তি, সে বিষয়ে সে সম্পূর্ণ একক বা অপ্রতিহত নয়। শীগগিরই তার পিতার মধ্যে সে আবিষ্কার করে তার এক প্রতিদ্বন্দ্বীকে। ফলে, শিশুর মধ্যে দেখা দেয়, তাঁর পিতার সম্বন্ধে এক বিরুদ্ধ মনোভাব ও ঈর্ষা। মায়ের প্রতি এই যে আসক্তি,—যার শুধু মাত্র মানসিক দিকটাকে বলা যায় ভালোবাসা, এবং সঙ্গে সঙ্গে পিতার সম্বন্ধে এক বিরুদ্ধ মনোভাব ও ঈর্ষা—এদের নিয়ে এই স্তরের নাম দেওয়া হয়েছে 'ঈডিপাস অবস্থা' (Oedipus situation) গ্রীক পুরানে ঈডিপাস নামে এক রাজার গল্প আছে। তিনি একবার নিজের অজ্ঞাতসারে মাতৃগমন করেছিলেন। পরে যখন তিনি ব্যাপারটা জানতে পারলেন, তখন অনুশোচনায় পড়ে নিজের চোখ উপড়ে ফেলে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছিলেন। কাম প্রবৃত্তি বিকাশের এই স্তরের নাম-

করণের অর্থ ও তাৎপর্য এই গল্পটির মধ্যে পাওয়া যাবে। এই অবস্থার পর আরও কয়েকটি স্তর পার হয়ে শিশু এসে পৌঁছয় পরিণত অবস্থায়। এই সময় থেকেই দেখা দেয় মেয়ের প্রতি ছেলের, ও ছেলের প্রতি মেয়ের আকর্ষণ।

মনঃসমীক্ষণের এই যে তত্ত্বগত সিদ্ধান্ত—মানুষের কোন মনোবৃত্তিই বিচ্ছিন্ন বা আকস্মিক নয়; সমস্ত এবং আচরণ ব্যবহারের মূল উৎস হচ্ছে শিশুকালের কামনা বাসনা,—এরই থেকে এসে পড়ে আর একটি সিদ্ধান্ত। সেটি হচ্ছে মনের স্বরূপ সম্বন্ধে। 'মন' বলতে সাধারণতঃই আমরা বুঝি সংজ্ঞান মন। অর্থাৎ মন ও সংজ্ঞান আমাদের কাছে এক ও অভিন্ন। কিন্তু আমাদের শৈশব জীবনের কামনা বাসনা, তাদের প্রকৃতি ও কার্য, এবং অবদমন সম্বন্ধে ফ্রয়েড যে নতুন কথা শোনালেন, তা' যদি সত্য হয়, তবে মানতেই হবে যে, মন ও সংজ্ঞান এক নয়। সংজ্ঞান অপেক্ষা মন আরও ব্যাপক। মনের কোন অবদমিত কামনাকে সংজ্ঞানের স্তরে খুঁজে পাওয়া যায় না। এবং বিশেষ বিশ্লেষণ পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ করে তবেই তাকে সংজ্ঞানের মধ্যে নিয়ে আসা সম্ভব হয়। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যে, সংজ্ঞানের মধ্যে যদি সে না-ই থাকে তবে থাকে কোথায়? এই দিক থেকে বিচার করে ফ্রয়েড বললেন যে, মনের সীমানা শুধু মাত্র সংজ্ঞানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। সে আরও ব্যাপক। সংজ্ঞান হচ্ছে তার একটি মাত্র অংশ। আরও দু'টি অংশ তার আছে—

আসংজ্ঞান (Preconscious), ও নির্জ্ঞান (unconscious). অর্থাৎ মনের তিনটি স্তর—সংজ্ঞান (Conscious), আসংজ্ঞান (Preconscious), ও নির্জ্ঞান (Unconscious)। যে সমস্ত ঘটনা, চিন্তা ভাবনা বাসনা ইত্যাদি আমার মনে বর্তমান রয়েছে, মনের দিকে তাকালেই যাদের আমি দেখতে পাচ্ছি, তাদেরই বলা হচ্ছে সংজ্ঞান মনের অধিবাসী। আমি হয়তো কোন একটা পরীক্ষার জন্য তৈরী হচ্ছি। আমার মনের দিকে তাকালেই দেখা যাবে যে, আমার মনকে জুড়ে রয়েছে আসন্ন পরীক্ষা ও তারই আনুষঙ্গিক অন্যান্য চিন্তা। এইটেই হচ্ছে আমার সংজ্ঞান মন। আবার অন্য অনেকগুলি বিষয় আছে যা এই মুহূর্তে আমার মনে নেই, আমি ভুলে গেছি ; কিন্তু অল্প চেষ্টাতেই মনে এসে যায়। যেমন, কাল আমার সঙ্গে দেখা করতে যে ভদ্রলোকটি এসেছিলেন, তার নামটা হঠাৎ মনে আসছে না। একটু চেষ্টা করলেই এসে যাচ্ছে। মনের এই যে ঘটনা, যা' এখনই আমার সংজ্ঞান মনে উপস্থিত নেই, কিন্তু অল্প চেষ্টাতেই যাকে উপস্থিত করা যায়, এরাই হচ্ছে আসংজ্ঞান মনের অধিবাসী। আবার এমন অনেক ঘটনা আছে যা হয়তো কোন এক সময়ে আমার জীবনে ঘটেছিলো, কিন্তু আজ আর তা আমার একেবারেই মনে নেই ; চেষ্টা করেও আমি তাদের মনে করতে পারি না—এরা হচ্ছে তৃতীয় স্তরের অধিবাসী, এবং এই তৃতীয় স্তরের নাম হচ্ছে নির্জ্ঞান। এর সম্বন্ধে কোন ধারণাই আমাদের নেই ; এর

কথা কখনই আমরা জানি না ; তবু এর অস্তিত্বে সন্দেহ করার কিছু নেই। ফ্রয়েড তার প্রমাণ দিয়েছেন। সে প্রমাণ পেতে হলে আমাদের যেতে হবে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের ভুল ভ্রান্তি, স্বপ্ন ও উদ্বায়ু রোগীর কাছে।

দীর্ঘ দিন ধরে পরীক্ষাদি ও গবেষণা করে ফ্রয়েড দেখলেন যে, আমাদের দৈনন্দিন জীবনের যে সমস্ত ভুল ভ্রান্তি, যেমন নাম ইত্যাদি ভুলে যাওয়া, কথাবার্তা বলার সময়ে এক কথার জায়গায় অন্য আর একটি কথা ব্যবহার করা—এরা মোটেই অর্থহীন নয়। আমি হয়তো একটি লোকের নাম বহু চেষ্টাতেও মনে আনতে পারছি না, অথচ, লোকটি আমার অত্যন্ত পরিচিত ; সেদিন আমার এক বন্ধু 'styled' কথাটি বলতে গিয়ে বললেন 'signed' ; একজন অর্থনীতির অধ্যাপক 'dollar' কথাটি বলতে গিয়ে প্রায়ই ভুল করে বলেন 'darling.' এ রকম বহু দৃষ্টান্ত আমাদের দৈনন্দিন জীবনের মধ্যে দেখা যাবে। চিঠি লিখে তার ঠিকানা লিখতেই হয়তো আমি ভুলে গেলাম ; কিংবা ঠিকানা যদিও লিখলাম, দেখা গেলো আমার নিজেরই ঠিকানা লিখে বসে আছি। এসব ব্যাপারের মধ্যে যে কোন গূঢ় অর্থ থাকতে পারে, সেকথা আমরা ভাবতে পারি না। সাধারণতঃ আমরা বলবো যে, ব্যস্ততা, অন্যমনস্কতা, মস্তিষ্কের দুর্বলতা, একাধিক শব্দের ধ্বনিগত সাদৃশ্যের জন্য এরকম ভুল ভ্রান্তি হয়েই থাকে। এর মধ্যে অন্য কোন অর্থ খুঁজতে যাওয়া বাতুলতা মাত্র।

এই মতবাদের প্রত্যেকটি যুক্তিই ফ্রয়েড বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে বিচার করেছেন। কিন্তু দেখা গেছে যে, এই সব জিনিষকে ভুল ভ্রান্তির কারণ বলে স্বীকার করা যায় না। এরা বড়ো জোর ভুল ভ্রান্তি ঘটার পক্ষে কোন কোন ক্ষেত্রে সাহায্য করে মাত্র। কিন্তু মূল কারণ হিসেবে এরা ব্যর্থ। মূল কারণ পেতে হলে যেতে হবে আরও গভীরে। নানা জাতীয় ভুল ভ্রান্তি নিয়ে পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তাদের পিছনে রয়েছে অন্তর্দ্বন্দ্ব। যে কথাটি আমি বলতে যাচ্ছি তার সঙ্গে বিরোধিতা করছে আর একটি মনোভাব। এই দু'টির পরস্পরের বিরোধিতা ও সংঘাতের ফলেই যেখা দিচ্ছে আমার কথার মধ্যে ভুল ভ্রান্তি। ফ্রয়েডের পরিচিত এক ভদ্রলোক ফ্রয়েডের সঙ্গে একবার দেখা করার জন্য একটা দিন ঠিক করে বলতে যাচ্ছিলেন 'মজদুর দিবস' (Labour day, অর্থাৎ ১লা সেপ্টেম্বর)। মজদুর দিবসে তিনি ফ্রয়েডের সঙ্গে দেখা করতে আসবেন, এইটেই ছিলো তাঁর বক্তব্য। কিন্তু বলতে গিয়ে 'মজদুর দিবস' এর পরিবর্তে বলে ফেললেন 'নির্বাচন-দিবস' (Election day, অর্থাৎ নভেম্বর মাসে)। ভদ্রলোকের এই ভুলটি অত্যন্ত স্পষ্ট। তিনি যেখানে ছিলেন, সে জায়গাটা কিছু দূরে। তাই অতো দূরে যেতে ফ্রয়েড রাজী না হওয়ায়, বিশেষতঃ সামাজিক ভদ্রতার দিক থেকে এবার তাঁর নিজেরই আসা উচিত বোধ হওয়ায়, মজদুর দিবসটা তিনি স্থির করেছিলেন। কিন্তু

বাস্তবিক পক্ষে অতোটা পথ আসার ইচ্ছে তার ছিলো না। এবং আরও উল্লেখযোগ্য এই যে, নভেম্বর মাসে ওদের দুজনেরই একই সহরে থাকার সম্ভাবনা ছিলো। "এবার যদি আমাকেই যেতে হয়, তাহলে আর গিয়েই কাজ নেই ; বরং নভেম্বর মাসে দেখা হবে—" এই জাতীয় এক মনোভাব ভুলের কারণ। এই রকম কতকগুলি ক্ষেত্রে বিরোধী মনোভাবটি অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট, এবং বক্তা নিজেই সে বিষয়ে সচেতন, অথবা অল্পেই স্বীকার করে নেবেন। কিন্তু এমন ক্ষেত্র আছে যেখানে বিরোধী মনোভাবটি বক্তার কাছে শুধু যে অজ্ঞাত তাই নয়, তাকে স্বীকার করতেও তিনি ঘোরতর আপত্তি করবেন। কেননা, সেই বিরোধী মনোভাবটি তার সংজ্ঞান মনে নেই ; তাকে তিনি সম্পূর্ণ অবদমন করে নিমজ্জিত করে ফেলেছেন নির্জ্ঞানের গভীরে। এই শ্রেণীর বহু দৃষ্টান্তের উল্লেখ ও বিশ্লেষণ ফ্রয়েড ও অন্যান্য মনঃসমীক্ষকের লেখায় পাওয়া যাবে। সব সময়েই দেখা যাবে যে, আমাদের যে-কোন ভুলের পিছনে লুকিয়ে রয়েছে একটা কামনা। যে-কাজ করতে যাচ্ছি, বা যে কথা বলতে যাচ্ছি, সেই কাজ করার বা সেই কথা বলার গোপন অনিচ্ছা, বা সেই সংক্রান্ত কোন অবরুদ্ধ কামনার প্রকাশই এই জাতীয় ভুল ভ্রান্তির মধ্য দিয়ে হয়ে থাকে। অর্থাৎ ভুল দ্বারা আমাদের কোন না কোন উদ্দেশ্য সাধিত হয়। এই উদ্দেশ্য সাধারণতঃ আমাদের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না। কেননা সে বাস করে আমাদের

নির্জ্ঞান মনে। লেখার ভুল, দেখার ভুল, পড়ার ভুল, সর্বত্রই এই এক নীতি। কোন নাম বা কোন কাজ ভুলে যাওয়া, যাকে সাধারণ ভাষায় বলে বিস্মৃতি—সেখানেও কোন একটি গোপন উদ্দেশ্য সেই বিস্মৃতির জন্য দায়ী। যে-নাম বা যে-জিনিষ ভুলে যাচ্ছি তার সঙ্গে এমন কোন একটি ঘটনা জড়িত আছে যা আমার কাছে সম্পূর্ণ অপ্রীতিকর। কাজেই তাকে ভুলে গিয়ে সেই অপ্রীতিকর পরিস্থিতি থেকে আমি মুক্ত থাকতে চাই।

স্বপ্নের ক্ষেত্রে এই জিনিষটি আরও স্পষ্ট। ফ্রয়েড বলেন যে, আমাদের অন্তর্নিহিত গোপন কামনা চরিতার্থ করাই হচ্ছে স্বপ্নের উদ্দেশ্য ও অর্থ। মানুষের মনে অসংখ্য কামনা ও বাসনা। তারা প্রত্যেকেই চায় নিজেকে চরিতার্থ করতে। কিন্তু আমরা তা করতে দিই না। আমাদের শিক্ষা, নীতিবোধ, সামাজিক অনুশাসন অনুসারে কতকগুলি বাসনাকে আমরা প্রশ্রয় দিতে পারি না। সেগুলিকে আমরা বলি অন্যায়, অশোভন ও নীতিবিরুদ্ধ। কিন্তু তারা যাবে কোথায়? ফ্রয়েড বলেন যে, নিজেকে প্রকাশ করতে না পেরে, এবং সংজ্ঞান মন থেকে বিতাড়িত হয়ে তারা আশ্রয় গ্রহণ করে নির্জ্ঞান মনে। কিন্তু সেখানে গিয়ে তারা নিশ্চেষ্ট বসে থাকে না। আত্মপ্রকাশ করার জন্য নানা প্রকার পথ খুঁজতে থাকে। স্বপ্ন হচ্ছে সেই উপায়। বাস্তব জীবনে যে কামনা বা বাসনাকে আমি চরিতার্থ করতে পারিনি, স্বপ্নের কল্পিত

রাজ্যে তাকেই চরিতার্থ করে আমি আনন্দ পাই। কিন্তু স্বপ্নে দেখা যায় নানা প্রকার অদ্ভুত খাপছাড়া জিনিষ যাকে নিতান্তই হাস্যকর মনে করা যেতে পারে। কাজেই সেখানে যে কীভাবে আমাদের কামনা চরিতার্থ হতে পারে, এ আমরা বুঝি না। ফ্রয়েড বলেন, একথা বুঝতে হলে স্বপ্ন সম্বন্ধে কয়েকটি প্রয়োজনীয় কথা মনে রাখতে হবে। প্রথমতঃ, স্বপ্নের দুটি অংশ আছে—ব্যক্ত, ও অব্যক্ত। মনের অবদমিত গোপন কামনা প্রতিনিয়তই আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজছে; অন্তর্নিহিত এই যে অবদমিত চঞ্চল কামনা, এদেরই বলা হয় স্বপ্নের অব্যক্ত অংশ (latent content) এবং স্বপ্নের মধ্যে যে ঘটনা বা যে বস্তু আমি দেখছি তাকে বলা হয় ব্যক্ত অংশ (manifest content)। স্বপ্নের যে জিনিষটা অদ্ভুত ও খাপছাড়া মনে হয় সে হচ্ছে এই ব্যক্ত অংশ। কিন্তু ব্যক্ত অংশের বিভিন্ন উপাদানগুলিকে বিশ্লেষণ করে তাদের অন্তরালে যে অব্যক্ত অংশের সন্ধান পাওয়া গেছে, সেখানকার কোন জিনিষই খাপছাড়া, অদ্ভুত বা অর্থহীন নয়। ব্যক্ত-অংশ ও অব্যক্ত অংশে এই যে অমিল ও পার্থক্য, এর কারণ হচ্ছে— অন্তর্নিহিত অব্যক্ত অংশটি ব্যক্ত অংশে আত্মপ্রকাশ করার সময়ে নিজের স্বরূপে সে আসেনা, আসে বিভিন্ন ছদ্মবেশ নিয়ে। এই ছদ্মবেশটিই আমাদের কাছে খাপছাড়া ও অদ্ভুত মনে হয়।

এখানে দু'টি প্রশ্ন হতে পারে। প্রথমতঃ ছদ্মবেশের প্রয়োজন কী? বাইরের সমাজতো আর সেখানে নেই;

কাজেই যে-কোন কামনা ভাবনা যে-কোন ভাবে এলেও আপত্তির কোন কারণ থাকতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, ছদ্মবেশ নেবার বিশেষ কোন পদ্ধতি আছে কি-না। প্রথম প্রশ্নটির উত্তরে ফ্রয়েড বলেন—ছদ্মবেশের যথেষ্ট কারণ আছে। শিক্ষা, নীতিবোধ ও সামাজিক অনুশাসনের ফলে আমাদের মধ্যে একটি চেতনা গড়ে উঠেছে যা নাকি আমাদের জীবনে সব সময়েই প্রহরীর কাজ করছে। কোন অপ্রিয়, অন্যায় ও অশোভন কামনাকে কোন সময়েই সে অচেতন মনের বাইরে আসতে দেবে না। আমরা যখন ঘুমিয়ে, তখনও তার সেই সতর্ক দৃষ্টি জাগ্রত থাকে। কাজেই অবদমিত কামনার পক্ষে ছদ্মবেশ নেওয়া ভিন্ন আর কোন উপায় থাকে না। দ্বিতীয়তঃ, বিশ্লেষণের ফলে দেখা গেছে যে, ছদ্মবেশ গ্রহণ করে আত্ম-প্রকাশ করার সময়ে অন্তর্নিহিত অতৃপ্ত কামনা বিশেষ কতকগুলি পদ্ধতি অবলম্বন করে। তাদের নাম দেওয়া হয়েছে—সংক্ষেপন (condensation), অভিক্রান্তি (displacement), নাটজ (dramatisation), ও অনুযোজনা (secondary elaboration). আমি হয়তো স্বপ্নের মধ্যে দেখছি রামবাবুকে ; তার পোষাক পরিচ্ছদ ইত্যাদি যেন শ্যামবাবুর ; অথচ তার কথাবার্তা যেন হরিবাবুর মতো। এইভাবে পরস্পর বিরুদ্ধ কতকগুলি বস্তুর একত্র সমাবেশ, ও তাদের সম্মেলনে যে অবাস্তব ছবি স্বপ্নের মধ্যে আমার সামনে উপস্থিত হচ্ছে তাকেই বলা হয় সংক্ষেপন—অর্থাৎ একাধিক বস্তু ও ঘটনা

থেকে কিছু কিছু অংশ নিয়ে, জোড়া তালি দিয়ে তাদের একটা সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। এই সংক্ষেপন থেকেই আসে অভিক্রান্তি। স্বপ্নের অব্যক্ত অংশে যে ঘটনা বা বস্তুর যে গুরুত্ব, ব্যক্ত-অংশে তা' অনেক সময়ে অন্য কোন ঘটনা বা বস্তুর উপর ন্যস্ত হতে দেখা যায়। অন্তর্নিহিত মূল কামনার ভার কেন্দ্রটিই যেন সরে গেছে ব্যক্ত অংশে এসে। যেমন স্বপ্নের মধ্যে আমি হয়তো একটা হিংস্র সিংহের সামনে দাঁড়িয়ে মজা দেখছি ও হাসছি; আর সামান্য একটা ছাগল থেকে ছুটে পালাচ্ছি। আমার মূল কামনার সঙ্গে এই হাস্যকর লঘুতার কোন সম্বন্ধ নেই। তবু আমি তাদের দেখছি, তার কারণ আমার অবদমিত কামনার তীব্রতা ও উগ্রতা এতো বেশী যে, নীতিদণ্ডধারী প্রহরীর হাত এড়িয়ে আত্মপ্রকাশ করতে হলে, তাকে হতেই হবে অত্যন্ত বিনীত, লঘু ও নির্দোষ। তা না হলে প্রহরী তাকে বাইরে আসতে দেবে না। কাজেই অব্যক্ত অংশে যে সমস্ত বস্তুর যে মর্যাদা মূল্য ও গুরুত্ব, ব্যক্ত অংশে তা' প্রায়ই দেখা দেয় উলট্ পালট্ হয়ে। এরই নাম অভিক্রান্তি। কিন্তু অতীত বা ভবিষ্যতের যে কোন ঘটনা হোক্ না কেন, বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে ছাড়া তাকে ব্যক্ত করা যায় না। শ্রীরঙ্গমে আলমগীর যখন আমরা দেখি, তখন দু'শো বছর আগের ঘটনাকে সাজ সজ্জায়, রূপে, অভিনয়ে মূর্ত করে যারা তুলছেন, তারা আজকের দিনেরই অভিনেতা অভিনেত্রী। তেমনি স্বপ্নের মধ্যেও প্রয়োজন হয় অতীত বা ভবিষ্যতের

সমস্ত ঘটনাকে বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে সজ্জিত করার। একেই বলা হয় নাটজ। অর্থাৎ অতীত অথবা ভবিষ্যত, যে-কোন সময়ের ঘটনা থেকে উপাদান সংগ্রহ করে স্বপ্ন গঠিত হোক না কেন, তাকে মনে হবে বর্তমানেরই জিনিষ। আবার একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, স্বপ্নের ব্যক্ত অংশে যে যে ঘটনা দেখা গিয়েছিলো, জাগ্রত অবস্থায় তাকে বর্ণনা করতে গিয়ে কিছু কিছু হয়তো বাদ প'ড়ে গেছে। স্বপ্নের এই বৈশিষ্ট্যকে বলা হয় অনুযোজনা।

স্বপ্ন সম্বন্ধে আর একটি কথা বললে এবিষয়ে মোটামুটি একটি ধারণা আমরা করতে পারবো। সে হচ্চে স্বপ্নের প্রতীক (symbol) ; আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, স্বপ্নের অব্যক্ত অংশ থেকে ব্যক্ত অংশে আসতে হলে মনের প্রহরীর কাছ থেকে ছাড়পত্র নিয়ে তবে আসতে হবে। আর, তার জন্যে আমাদের অন্তর্নিহিত কামনা আশ্রয় নিয়ে থাকে ছদ্মবেশের। কাজেই ব্যক্ত অংশের ছদ্মবেশ যদি খুলে ফেলা যায় তবেই আমরা দেখতে পাবো তার প্রকৃত রূপ ও অর্থ। একাজ করার একটা উপায় হচ্ছে ভাবানুষঙ্গ পদ্ধতি। ব্যক্ত স্বপ্নে যা যা আমি দেখেছি তার এক একটি উপাদান অবলম্বন করে আমার মনে কী কী ভাব বা চিন্তা দেখা দেয়, তার হিসাব নিয়ে বিচার করলেই স্বপ্নের মূল অর্থটি ধরা পড়বে। কিন্তু দেখা গেছে যে অনেক সময়ে এই প্রণালীর দ্বারা বিশেষ কোন ফল পাওয়া যাচ্ছে না। বার বার চেষ্টা করেও স্বপ্ন-

দ্রষ্টার কাছ থেকে এমন কিছু পাওয়া যাচ্ছে না, যার সাহায্যে তার স্বপ্নটি পরিষ্কার হয়ে উঠ্‌তে পারে। কাজেই সেখানে প্রয়োজন হয় অন্য কোন উপায়। সেই উপায় হচ্ছে প্রতীকের বিশ্লেষণ। স্বপ্নদ্রষ্টাকে কোন প্রশ্ন না করেও এই পদ্ধতির সাহায্যে গূঢ় অন্তর্কামনা সম্বন্ধে জানা যেতে পারে। কেননা দেখা গেছে যে, অব্যক্তঅংশ থেকে ব্যক্ত অংশে আসার সময়ে ছদ্মবেশ ধারণের জন্য আমাদের কামনা কতকগুলি প্রতীকের সাহায্য নিয়ে থাকে; ব্যক্তস্বপ্নে প্রতীকের ব্যবহার তাই খুব বেশী। প্রতীক হচ্ছে গোপন কামনার প্রতিনিধি। গোপন কামনা যখন সোজাসুজি নিজেকে প্রকাশ করার সুযোগ পেলোনা, তখন পাঠিয়ে দিলো এমন কতকগুলি জিনিষ যাদের সঙ্গে অনুষঙ্গ সম্বন্ধ দ্বারা সে বিশেষ সম্বন্ধযুক্ত। নিজে যে কাজ করতে পারলোনা প্রতিনিধির দ্বারা সেই সে করিয়ে নিলো। যে সমস্ত জিনিষ প্রতীকের সাহায্যে অভিব্যক্ত হয়, তারা প্রধানতঃই হচ্ছে মানবদেহ, পিতামাতা, শিশু, জন্ম, মৃত্যু, নগ্নতা, যৌনঅঙ্গ। যেমন, মানবদেহের প্রতীক হচ্ছে গৃহ; পিতামাতার রাজা-রাণী; জন্মের জল; পুরুষ জননেন্দ্রিয়ের খাপ, ছাতা, কলম, বন্দুক ইত্যাদি; স্ত্রীজনেন্দ্রিয়ের বাক্স, কোন কিছুর আধার; জুতো, জলাভূমি ইত্যাদি; নগ্নতার, জামাকাপড়। এই হচ্ছে প্রতীকের অর্থ। কিন্তু প্রশ্ন হতে পারে যে, বিশেষ করে এই জিনিষগুলি প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়, তার কারণ কি?

এর উত্তরে ফ্রয়েড বলছেন যে, আদি যুগে এই প্রতীকগুলি, ও যে সমস্ত জিনিষের প্রতিনিধিত্ব তারা করছে তাদের মধ্যে ভাষাগত ও ভাবগত ঐক্য ছিলো। ফলে বর্তমান যুগে এসে একের পরিবর্তে ব্যবহৃত হচ্ছে অন্যটি। এই ভাষাগত ও ভাবগত ঐক্যটি (linguistic and conceptual identity) জানা না থাকলে স্বপ্নবিশ্লেষণে প্রতীকের সাহায্য নেওয়া অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে।

এ পর্যন্ত আমরা ফ্রয়েডের মনোবিজ্ঞানের দু একটি মূল সিদ্ধান্তের পরিচয় পেয়েছি ; এবং সেই সিদ্ধান্তের ভিত্তি যে কোথায় দৈনন্দিন জীবনের ভুল ভ্রান্তি ও স্বপ্ন প্রসঙ্গে তা' আমরা দেখেছি। যে নীতির সন্ধান আমরা পেয়েছি স্বপ্ন ও ভুল ভ্রান্তির মধ্যে, ফ্রয়েডের মতে সেই একই নীতির সন্ধান পাওয়া যাবে, উদ্বায়ু রোগ (neurosis) বা নানাপ্রকার মানসিক বিকার ও বিশৃঙ্খলার মধ্যে। কেননা, মূলতঃ তারা একই জিনিষ। সমস্ত মানসিক বিকারের মূলে ফ্রয়েড কয়েকটি বিশেষ ঘটনার উল্লেখ করেছেন। প্রথমতঃ, ফ্রয়েডের অভিজ্ঞতায়, সম্পূর্ণ সুস্থ ও স্বাভাবিক যৌনজীবনে কোন প্রকার বিকার অসম্ভব। অর্থাৎ মনোবিকারের মূলে সর্ব প্রধান কথা যৌন জীবন সংক্রান্ত কোন বিশৃঙ্খলা। শিশুকাল থেকে আরম্ভ করে পরিণত বয়স পর্যন্ত ক্রমবিকাশের প্রত্যেকটি স্তরে, কামপ্রবৃত্তিকে বিবেক, নীতিবোধ, সামাজিক অনুশাসন ইত্যাদির সম্মুখীন হতে হয়। সম্পূর্ণ আদিম ও

অবিকৃত রূপে কখনই সে অগ্রসর হতে পারে না। প্রতি পদেই তাকে চলতে হয় বাস্তবের সঙ্গে সামঞ্জস্য করে। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে এমন দেখা যায় যে সামঞ্জস্য আর হয়ে ওঠে না। তখন দেখা দেয় কামপ্রবৃত্তি ও বিবেক বোধের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ। ফলে তখন কামপ্রবৃত্তি বাধ্য হয় স্বাভাবিক পথ ত্যাগ করে অন্য কোন পথ নিতে। এবং সেই পথ সে খুঁজে নেয় প্রতিগমনের (regression) মাঝ দিয়ে। অর্থাৎ সে তখন আশ্রয় নেয় তার ক্রমবিকাশের এমন কোন একটি স্তর যাকে সে অনেক আগেই অতিক্রম করে এসেছে। সামনের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে সমস্ত বাস্তব জগত, বিবেক ও নীতি বোধকে অতিক্রম করে সে তখন ছুটে চলে আসে পিছনে ফেলে আসা শিশুকালের কোন অভিজ্ঞতার কাছে। ফলে তার আচরণে দেখা দেয় এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণ যার অর্থ তাৎপর্য ও প্রাসঙ্গিকতা খুঁজে পাওয়া যাবে না তার বর্তমানের মধ্যে। এই অবস্থাকেই বলা হয় উদ্বায়ুরোগ বা মানসিক বিকার। এ প্রসঙ্গে ফ্রয়েড যে গবেষণা করেছেন, তা যেমনই দীর্ঘদিনব্যাপী ও অতিবিস্তৃত, তেমনি অভিনব। ফ্রয়েড প্রমাণ করেছেন যে, মানুষের আদিম কাম প্রবৃত্তিগুলি অবদমিত হলেও চুপ করে বসে থাকে না। নানা ভাবে তারা আত্মপ্রকাশ ও আত্মতৃপ্তির পথ খুঁজতে থাকে। তার মধ্যে একটা পথের পরিণতি হচ্ছে মানসিক বিকার; আর অন্য একটা পথের হচ্ছে শিল্পকলা সাহিত্য ইত্যাদি।

কোন অবদমিত অসামাজিক কামনা যদি নিজেকে প্রকাশ করতে পারে সমাজ অনুমোদিত কোন পথ অবলম্বন করে (sublimation), তাহলে সেখানে দেখা দেবে শিল্পকলা ইত্যাদি। আর, তা যদি সে না পারে তবেই দেখা দেবে উদ্বায়ুরোগ।

অত্যন্ত সংক্ষেপে এই হচ্ছে ফ্রয়েড প্রবর্তিত মনোবিজ্ঞানের সাধারণ কথা। আগেই আমরা উল্লেখ করেছি যে, এই মনোবিজ্ঞানের উৎপত্তি হয়েছে চিকিৎসার মধ্য দিয়ে। কিন্তু নিজের পরীক্ষালব্ধ আবিষ্কারকে আরও গভীরভাবে জানতে গিয়ে, সমগ্র মানুষের প্রকৃতি ও স্বরূপ সম্বন্ধে এমন কতকগুলি বিস্ময়কর আবিষ্কার তিনি করেছেন, যা আজ আর শুধুমাত্র ব্যধিগ্রস্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ তো নয়ই, এমন কি মানবজীবনের বিশেষ কোন এক দিকেও সে সীমাবদ্ধ নয়। সে আজ ছড়িয়ে পড়েছে আমাদের সমগ্র জীবনের উপর। আমাদের সমাজ, ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য শিল্পকলা ইত্যাদি সমস্তই আজ এর দ্বারা প্রভাবান্বিত। অবশ্য ফ্রয়েডের সব কথাই যে সত্য, এ কথা অনেকে মানেন না। এমন কি ফ্রয়েডেরই সহকর্মীদের মধ্যে কেহ কেহ তাঁর সঙ্গে শেষ পর্যন্ত একমত হতে পারেন নি। ফ্রয়েডের সমস্ত মতবাদ তাঁরা স্বীকার করেন না। তবু ফ্রয়েডের আবিষ্কারের গুরুত্ব, এবং মানুষের চিন্তার ইতিহাসে তাঁর দান ও স্থান স্বীকার করেন সকলেই। এই সব বিরুদ্ধ মতাবলম্বী মনোবিজ্ঞানের কথা আমরা পরবর্তী অধ্যায় থেকে আলোচনা করবো।

ইয়ুং ও তার বিশ্লেষণী মনোবিজ্ঞান

বিশ্লেষণী মনোবিজ্ঞান (Analytical Psychology) বলতে মনোবিজ্ঞানের যে বিশেষ মতবাদটি বোঝায় তার প্রবর্তক হলেন সুইস্ চিকিৎসক সি, জি, ইয়ুং (C. G. Jung)। ১৮৭৫ সালের ২৬শে জুলাই সুইজারল্যাণ্ডে এর জন্ম হয়। প্রথমে ইনি ফ্রয়েডের সঙ্গে একযোগে কাজ করতে থাকেন, কিন্তু অল্প কিছুদিনের মধ্যেই ফ্রয়েড থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে আসেন, ও ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণ থেকে নিজের মতবাদের পার্থক্য নির্দেশ করার জন্য তার নাম দেন বিশ্লেষণী মনোবিজ্ঞান। আমরা দেখিতেছি যে ফ্রয়েড তাঁর মতবাদে মানুষের যৌন প্রবৃত্তির খুব বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। বলা যেতে পারে যে, মানব জীবনের মূলে এই এক যৌন প্রবৃত্তি ভিন্ন আর কিছুই দেখতে পাননি তিনি। মানুষের যা কিছু আচরণ ব্যবহার, আশা আকাংখা—তা সবই এই প্রবৃত্তির রূপান্তরমাত্র। কিন্তু ইয়ুং এই মতবাদকে মনে করেন অত্যন্ত একদেশদর্শী। তাই ফ্রয়েডের সঙ্গে তিনি একমত হতে পারলেন না। ফলে স্বাধীনভাবে গবেষণা ও পরীক্ষা করে তিনি গড়ে তুললেন তার বিশ্লেষণী মনোবিজ্ঞান।

বিশ্লেষণী মনোবিজ্ঞানের সর্ব প্রথম স্বীকৃতি হলো অন্ত-

নিরপেক্ষ স্বাধীন ও স্বতন্ত্র এক মনের অস্তিত্ব। সমগ্র উনবিংশ শতাব্দীটাকেই বলা যেতে পারে বিজ্ঞানের যুগ। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও জড়বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারে ও গবেষণায় সেই যুগের মন বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়ে উঠেছিলো; এবং মানুষের চিন্তা এতো বেশী পরিমাণে প্রভাবান্বিত হয়ে পড়েছিলো এই বিজ্ঞানের দ্বারা যে, যা কিছুই তার পরীক্ষাগার ও ইন্দ্রিয়ানুভূতির বাইরে তাকেই সে অস্বীকার করলো। এই জাতীয় এক অস্বীকৃতি ছিলো মন সম্বন্ধে। ফলে, সে যুগের মনোবিজ্ঞান প্রকৃতপক্ষে দেখা দিয়েছিলো "মনোহীন মনোবিজ্ঞান"রূপে (Psychology without psyche)। এরা বলছিলেন যে মনের কোন স্বাধীন ও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। মন বা চেতনা —জড়পদার্থেরই ক্রমবিকশিত রূপান্তর মাত্র। কিন্তু ইয়ুং একথা মানলেন না। তিনি বললেন যে, অত্যন্ত ভুল একথা। কেন না, অন্ততঃ মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মনের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব না মেনে উপায় নেই। আর, তাই যদি ঠিক হয়, অর্থাৎ মন যদি অন্য-নিরপেক্ষ স্বাধীন ও স্বতন্ত্র হয় তবে এটাও মানতে হবে যে, জড়দেহের সঙ্গে তার যে সম্বন্ধ তা অবিচ্ছেদ্য নয়। অর্থাৎ মন নৈর্ব্যক্তিক; ও যে কোন জ্ঞাতবিশেষের বাইরে (impersonal and objective)। আমাদের দৈনন্দিন জীবনেই মাঝে মাঝে এমন আকূতি দেখা দেয় যাকে কোন প্রকারে দমন করাই আমাদের পক্ষে সহজ হয়ে ওঠে না। মন খারাপ হলে ইচ্ছে মতো তাকে আমরা ভালো করে ফেলতে

পারি না। স্বপ্নের মধ্যে কি দেখতে চাই, বা চাইনা, তার দ্বারা প্রকৃত স্বপ্নকেও আমরা নিয়ন্ত্রিত করতে পারি না। অতিশয় বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী ব্যক্তির মধ্যেও সময়ে সময়ে এমন এক আবিষ্টভাব (obsessed thought) দেখা যায়, যাকে যুক্তি তর্ক বিচার কোন কিছুতেই দূর করা তার পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠে না। এই সব ব্যাপার থেকে বোঝা যাবে যে মনের উপর প্রকৃতপক্ষে আমাদের কোন হাত নেই। এ কথাটা আরও বেশী সত্য এই জন্য যে আমাদের জীবন অবচেতনার দ্বারা এতো বেশী পরিমাণে পরিচালিত হয়ে থাকে যে আমরা তা ধারণা করতেও পারি না। কিন্তু আদিম মানুষ এই সত্যটি মানতো ; আত্মা তার কাছে ছিলো নিজের বাইরে বস্তুগত কোন অস্তিত্ব, যার সঙ্গে কথা বলতেও পারতো। এই দৃষ্টান্তের উল্লেখ করে ইয়ুং বলছেন যে, নিজ অস্তিত্বের বাইরে আত্মার বাস্তব অস্তিত্ব সম্বন্ধে আদিম যুগের এই যে ধারণা, এর বিরুদ্ধে সমর্থন যোগ্য কোন যুক্তিই নেই।

আত্মার যদি অন্য নিরপেক্ষ বাস্তব অস্তিত্ব থাকে, এবং আমাদের সচেতন কাজকর্ম যদি তারই দ্বারা পরিচালিত হয়, তবে আর একটা সিদ্ধান্ত সহজেই এসে পড়ে যে, সেই আত্মাই আমাদের জীবনের মূল উৎস। প্রকৃতপক্ষে ইয়ুং সেই কথাই বলেন। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, 'আমি' ভাব বা আত্মচেতনা জন্ম নেয় অচেতনার ভিতর দিয়ে। ছোট শিশুর জীবনে কোন আত্ম চেতনার সন্ধান পাওয়া যায় না। সেই

জন্যই ছোট বেলার স্মৃতি থাকেনা। তাহলে প্রশ্ন এই যে, আমাদের বুদ্ধি ইত্যাদি আসে কোথা থেকে। আমাদের উৎসাহ প্রেরণা উত্তেজনা ইত্যাদির মূলই বা কি? আদি মানবেরা আত্মার মধ্যেই খুঁজে পেয়েছিলো জীবনের সমস্ত উৎস। এই জন্যই তাদের কাছে আত্মা ও জীবন ছিলো এক। এর থেকে যদি মনে করা যায় যে, আত্মা অমর ও শাশ্বত, তাহলে তথা-কথিত আধুনিক জগতে হয়তো ব্যাপারটা হাস্যকর মনে হবে। কিন্তু ইয়ুংয়ের মতে এ কল্পনাতে খুব বেশী ভুল হবে না। কেন না, আত্মা মোটের উপর এমন একটা কিছু যা সাধারণের বাইরে। অন্যান্য প্রায় সব কিছু পদার্থই কিছু পরিমাণ স্থান অধিকার করে থাকে। কিন্তু আত্মাকে কোন স্থানেই পাওয়া যাবে না। সে দেশাতীত। মনের ক্রিয়া সমূহ দেহের কোন কোন স্থানে সীমাবদ্ধ বলে নির্দিষ্ট করার (localisation of psychic functions) চেষ্টা করা হয়েছে; কিন্তু প্রতিবারেই তা ব্যর্থ হয়েছে। তা' বাদে, মনের সম্বন্ধে কোন্ বিশেষণ প্রয়োগ করা যাবে। সে কি ক্ষুদ্র, বৃহৎ, সূক্ষ্ম, স্থূল, ভারী, তরল, সরল, বৃত্তাকার, বা অন্য কিছু? স্পষ্টতই এদের কোন বিশেষণই প্রয়োগ করা যায় না মন সম্বন্ধে।

অবশ্য মনের অস্তিত্ব অস্বীকার করলেই সমস্ত সমস্যাটা সহজ হয়ে যেতে পারে। কিন্তু তা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কিছু একটা যে আছে একথা অস্বীকার করা চলে না। মন যদি দেশাতীত হয় তাহলে তার অবয়ব থাকাও সম্ভব নয়;

এবং যার অবয়ব নেই, যে দেশাতীত ও নিরাকার, তার মৃত্যু নেই। আর যা অনন্ত, তা অনাদি না হলে অনন্ত নিজেই যুক্তির দিক থেকে বাধিত ও সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। তাহলে বলা যেতে পারে যে মানুষ তার নিজ 'আমি' সম্বন্ধে সচেতন হবার অনেক আগে থেকেই সেই 'মন' বর্তমান থাকে। এবং যেসময় সাময়িক ভাবে আমাদের সচেতনতা লুপ্ত হয়ে যায় তখনও সেই মন সম্পূর্ণ সক্রিয় থাকে। যেমন স্বপ্ন। এর থেকে আমরা আর একটা কথা বুঝতে পারি। আগের কালে 'মন'-কে অতি উচ্চ স্থান দেওয়া হয়েছিলো ; এবং সেই সময়ের সভ্যতায় 'স্বপ্ন' ও 'দৃষ্টি' (vision) কে জ্ঞানের উৎস বলে মনে করা হতো। তার কারণ সেই সময়ের লোকে মন সম্বন্ধে এই সত্যটি উপলব্ধি করতে পেরেছিলো। এই জাতীয় যুক্তি থেকে ইয়ুং মনোবিজ্ঞানে মনের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিলেন, ও বললেন যে মনোবিজ্ঞানের আলোচনা করবো, অথচ মনেরই কোন নিজস্ব অস্তিত্ব ও ক্রিয়াপদ্ধতি স্বীকার করবো না, এ অতি হাস্যকর প্রস্তাব। ফলে মনের অনস্বীকার্য স্বাধীন স্বতন্ত্র অস্তিত্বের ভিত্তিতে ইয়ুং তার বিশ্লেষণী মনোবিজ্ঞান গড়ে তুললেন ; ও তার আর এক নাম দিলেন, 'মনোময় মনোবিজ্ঞান' (Psycholosy with psyche)। ইয়ুংয়ের মনোবিজ্ঞান তাই এই মনেরই আলোচনা।

'মন' কথাটি ইয়ুং এক বিশেষ অর্থে ব্যবহার করেছেন। প্রচলিত অর্থে 'মন' বলতে আমরা চেতন-মনকেই বুঝে থাকি।

ইয়ুং মন কথাটি ব্যবহার করলেন চেতন ও অচেতন এই দুয়ের সমষ্টি নিয়ে। তাঁর মতে মনের দুটি অংশ—চেতন ও অচেতন। অচেতন অংশের আবার দু'টি বিভাগ বা স্তর আছে (১) ব্যক্তিগত অচেতন (২) সমষ্টিগত অচেতনা। সমগ্র অচেতন মন-কে চেষ্টা দ্বারা যতোদূর পর্যন্ত চেতনার স্তরে নিয়ে আসা যেতে পারে, ততোদূর পর্যন্ত হলো প্রথমস্তরের সীমানা। দ্বিতীয় স্তর আরম্ভ হলো ঠিক তার পর থেকে। মনের এ অংশের যে সমস্ত বিষয়, তা আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের নয়। আদিকাল থেকে পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত হয়ে হয়ে এরা আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে থাকে। এই পুরুষানুক্রমিতা পৃথিবীর সর্বজীবের মধ্যেই দেখা যায়। সেই-ই প্রত্যেক ব্যক্তিগত মনোজীবনের ভিত্তি। অচেতনার জন্ম হয়েছে চেতনার অনেক আগে। এবং এই প্রাথমিক তত্ত্ব থেকেই জন্ম নেয় নব নব চেতনা। মানুষের মানসিক জীবন প্রধানতঃই সচেতন, ইয়ুং-য়ের মতে এ ধারণা ভুল। বিষয়টিকে পরিষ্কার করে বুঝতে হলে ইয়ুং-য়ের মনোবিজ্ঞানে চেতনা ও অচেতনার গঠন ও প্রকৃতি, ও তাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ বিষয়ে কিছু আলোচনা করা আবশ্যক। ইয়ুং বলেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তিজীবনের চেতনার মধ্যে বিশেষ চারটি বৃত্তি আছে। তারা যথাক্রমে চিন্তা, অনুভূতি, সংবেদন, ও বোধি। পরিবর্তনশীল ও মূহূর্তগত বিভিন্ন মানসিক বৃত্তির অন্তরালে এরা এদের মূল স্বরূপে সব সময়েই বর্তমান থাকে। এরা

মৌলিক। যে মানসিক বৃত্তির দ্বারা জগৎ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা জন্মে, ও সেই ধারণা বা জ্ঞানের সাহায্যে পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে আমরা নিজেদের খাপ খাইয়ে নিই, সেই হলো চিন্তা। বুদ্ধি ও ন্যায়যুক্তি হলো এর মানদণ্ড। অনুভূতি এর ঠিক বিপরীত। এর মানদণ্ড হলো ব্যক্তিগত সুখদুঃখবোধ। চিন্তার মতো অনুভূতিও বিচার করে জগতের। কিন্তু কোন্ জিনিষ কি পরিমাণে সুখকর অথবা দুঃখকর, এরই ভিত্তিতে সে জগতের মূল্য নির্ধারণ করে। তবু চিন্তা ও অনুভূতির মধ্যে একটা মিল আছে এই যে, এরা দু'জনেই জগত-কে বুঝতে চায় বিশেষ এক মূল্যের দিক থেকে। চিন্তার দিক থেকে সেই মূল্য 'সত্য', ও তার মানদণ্ড হলো বুদ্ধি ও ন্যায়যুক্তি। আর অনুভূতির পক্ষে সে হলো সুখ অথবা দুঃখ। মানুষের আচরণে এরা পরস্পর বিপরীতধর্মী। অন্য যে দুটি বৃত্তি—সংবেদন ও বোধি—ইয়ুং তাদের বলেন অযৌক্তিক বৃত্তি। কেননা, তাদের মধ্যে বিচারের অবসর নেই। তারা বিচার করে না, বিশ্লেষণ করে না, বা কোন প্রকার মূল্য নিরূপনের চেষ্টা করে না। তাদের ক্রিয়া সীমাবদ্ধ শুধুমাত্র প্রত্যয়ের মধ্যে। উপস্থিত বস্তুকে ঠিক যথাযথ ভাবে প্রত্যয়ের গোচরে আনা সংবেদনের কাজ। বিষয়ের বাস্তব সত্যের পরিচয় আমরা পাই এরই কাছ থেকে। বোধি-ও বিষয়কে প্রত্যয়ের গোচরে আনে ; কিন্তু তার বাহ্যিক অবয়ব-রূপের দ্বারা নয়। এক প্রকার সহজ অভ্যন্তরীক দৃষ্টির দ্বারা সে

বিষয়বস্তুর অন্তরের স্বরূপটি প্রত্যক্ষ করে। এই দৃষ্টি সংবেদনের মতো সচেতন নয়—কিছু পরিমানে অচেতন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ যে-কোন একটি ঐতিহাসিক ঘটনাকে নেওয়া যেতে পারে। সংবেদন দেখবে ঘটনাটির খুটিনাটি বিশদ বিবরণ। কিন্তু বোধি ঐ খুটিনাটি বিশদ বিবরণকে সরিয়ে রেখে মূল ঘটনাটির বিশেষ একটি অর্থ ও তাৎপর্য অতি সহজেই বুঝে নেবে। এর থেকে বোঝা যাবে যে, এরাও চিন্তা ও অনুভূতির মতো পরস্পর বিপরীত ধর্মী।

মানুষের মধ্যে এই চারটি বৃত্তিই বর্তমান। কিন্তু ব্যবহারিক জগতে এরা সকলেই একসঙ্গে কার্যকরী হয় না। ব্যক্তি ভেদে এদের কোন একটি অন্য তিনটি অপেক্ষা অধিক প্রাধান্য লাভ করে থাকে। এবং মানুষ তার মধ্যের প্রধান বৃত্তিটিকে অবলম্বন ক'রে বহির্জগতের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়। এইটিই ক্রমে ক্রমে অধিকতর শক্তিশালী হয়ে ওঠে, ও জীবনের গতিপথ নির্দেশ করে। ইয়ুং এর নাম দিলেন উন্নততর বৃত্তি (superior function), ও বললেন যে, মানুষের জীবনে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের ভিত্তি হচ্ছে এই উন্নত বৃত্তি। যে যে মানুষের মধ্যে এই বৃত্তি এক ও অভিন্ন, তাদের আচরণ, ব্যবহার ও প্রকৃতির মধ্যে বিশেষ এক সাদৃশ্য দেখা যায়। সামাজিক, মানসিক ও নৈতিক স্তর ভেদে অবশ্য তাদের প্রকৃতিতে কিছুটা পার্থক্য দেখা যাবে সত্য, কিন্তু মূলগত ভাবে তারা এক। যে বৃত্তিটি উন্নত রূপে দেখা দেয়, তার জোড়ের অন্যটি দেখা

যায় ঠিক তার বিপরীত অবস্থায়। এই অন্যটির নাম হলো নিম্নতর বৃত্তি (inferior function), এবং সে বাস করে মনের অচেতন অংশে। মনে করা যাক কোন একজন লোকের মধ্যে উন্নত বৃত্তিটি হচ্ছে চিন্তা, অর্থাৎ লোকটি বুদ্ধিজীবি। যুক্তিবিচার ও বিশ্লেষণের সাহায্যে সে জগতের মূল্য নির্ধারণ করে। তাহলে তার মধ্যে নিম্নেতর বৃত্তি হবে অনুভূতি। অনুভূতি এখানে অচেতন মনের অধিবাসী। কাজেই লোকটির সম্পূর্ণ আয়ত্তের বাইরে। অন্য দু'টি বৃত্তি—বোধি ও সংবেদন—এরা থাকবে এদের দু'জনের মাঝখানে। এরা অংশত সচেতন ও অংশত অচেতন। সচেতন উন্নত বৃত্তি বাদে এরাও কিছু পরিমাণে মানবজীবনে সাহায্য করে থাকে। তাই এদের নাম হলো সাহায্যকারী বৃত্তি (auxiliary functions)।

(মোটের উপর এখানে আমরা মনের চারটি বৃত্তি দেখতে পাচ্ছি। (১) উন্নত বৃত্তি ;—এ সম্পুর্ণ সচেতন ; (২) সাহায্যকারী বৃত্তির সচেতন অংশ ; (৩) সাহায্যকারী বৃত্তির অচেতন অংশ। একে চেতনার স্তরে সচরাচর পাওয়া যায় না। কিন্তু চেষ্টা দ্বারা সম্ভব হতে পারে। (৪) নিম্নতর বৃত্তি, এ সম্পূর্ণ অচতন ও আমাদের আয়ত্তের বাইরে। যদি কখনও এই চারটিকেই চেতনার স্তরে নিয়ে আসা যায় তবেই মানুষের সম্পূর্ণতা আসবে। একটা নির্দ্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত তা সম্ভব হতে পারে। যদি কোন লোক একই সময়ে ঐ চারিটি বৃত্তিকেই অন্ততঃ কিছু পরিমাণেও নিজের

আয়ত্তের মধ্যে আনতে সমর্থ হতে পারে, তাহলে সে অসাধারণ জ্ঞান লাভ করবে। সংবেদন দ্বারা পাওয়া যায় বিষয়বস্তুর বাইরের অবয়ব সম্বন্ধে প্রত্যয় ; বোধি দ্বারা জন্মে তার অন্তর স্বরূপের জ্ঞান ; যুক্তি ও অনুভূতি দ্বারা পাওয়া যায় তার বিভিন্ন মূল্য। এই ভাবে সেই ব্যক্তি যে জ্ঞান লাভ করবে তা যেমনই সম্পূর্ণাঙ্গ, তেমনই গভীর। অবশ্য একথা ঠিক যে, এই জাতীয় জ্ঞান ও ব্যক্তিত্বের ক্রিয়াগত শ্রেণীবিভাগ সত্য শুধুমাত্র নীতি ও যুক্তির ক্ষেত্রে। প্রকৃত বাস্তব জীবনে জ্ঞান প্রায় কখনই সম্পূর্ণতা লাভ করে না, এবং ব্যক্তিত্বও কখনও অবিমিশ্র এক বৃত্তিগত নয়। সে সাধারণতই মিশ্র। সর্বক্ষেত্রেই দেখা যাবে, পরস্পরের পরিপূরক হিসেবে বিরুদ্ধ ধর্ম বিশিষ্ট দুইটি বৃত্তি, চিন্তা ও অনুভূতি ; সংবেদন ও বোধি। যে সমস্ত ক্ষেত্রে কোন একটি বৃত্তি, যেমন বুদ্ধি, খুব বেশী শক্তিশালী, সেখানে তার বিপরীত বৃত্তি, অনুভূতি প্রবলভাবে চেষ্টা করবে নিজের ক্ষতি পূরণের জন্য। ফলে একদিন দেখা যায় যে ঐ বুদ্ধিপ্রধান লোকটি হঠাৎ একদিন অত্যন্ত অসহায়ের মতো আক্রান্ত হয়ে পড়েছে দুর্দমনীয় এক ভাবাবেগ ও আদি মানবসুলভ স্বপ্নদ্বারা। লোকটি বুদ্ধিপ্রধান হওয়ায় তার মধ্যে অনুভূতি হচ্ছে নিম্নতর বৃত্তি। চিন্তা ও যুক্তির প্রবলতার জন্য সে কিছুতেই আত্ম-প্রকাশ করতে পারছে না। ফলে লোকটির জীবনে দেখা দিয়েছে চিন্তা ও যুক্তির একাধিপত্য। কিন্তু মনের গঠন ও বৈশিষ্ট্যের দিক এই একাধিপত্য মানসিক অসম্পূর্ণতার চিহ্ন।

তাই এই অসম্পূর্ণতার পরিপূরক হিসেবে হঠাৎ একদিন সুযোগ মতে দেখা দিলো অনুভূতির প্রাধান্য। মানসিক বৃত্তির মধ্যে পরিপূরণ ধর্ম ইয়ুংয়ের মনোবিজ্ঞানে মনের প্রকৃতির এক অন্তর্নিহিত নীতি।

জগতের সমস্ত মানুষের প্রকৃতি ঠিক এক রকমের নয়। ব্যক্তিগত রুচি, আদর্শ ও আচরণের দিক থেকে মানুষকে মোটামুটি কতকগুলি শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে। মনোবিজ্ঞানও এক প্রকার শ্রেণী বিভাগ করেছে। তার ভিত্তি হলো মানসিক বৃত্তি। আমরা একটু আগেই দেখেছি যে, ইয়ুং-য়ের মতে মানুষের মধ্যে চারটি প্রাথমিক বৃত্তি আছে। এই দিক থেকে সকল মানুষের মূল প্রকৃতি এক। কিন্তু এই বৃত্তিগুলি সকলের মধ্যে এক অবস্থায় নেই। কাহারও মধ্যে চিন্তাবৃত্তিটি প্রধান ও বলশালী, আবার অন্য কাহারও মধ্যে প্রধান ও বলশালী হলো অনুভূতি। সুতরাং দেখা গেছে যে, বৃত্তির দিক থেকে শ্রেণী বিভাগ নেহাত অসঙ্গত নয়। মনের প্রকৃতি নির্ণয়ে এই বৃত্তি দর্পণস্বরূপ। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, একমাত্র এই বৃত্তিদর্পণ থেকে আমরা ঐ লোকটির সম্পূর্ণ পরিচয় পেতে পারি না। তাহলে আমাদের আর একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে। বাইরের জগত ও মনোজগতের প্রতি সে কি ভাবে সাড়া দেয়, তার প্রতিক্রিয়ার সেই বৈশিষ্ট্যকে ভালো করে বুঝতে হবে। ইয়ুং সেই বৈশিষ্ট্যকে প্রধানতঃ দুটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন—বহির্মুখীন (extravert) ও অন্তর্মুখীন

(introvert)। বহির্মুখীন চরিত্র অতিমাত্রায় সমাজকেন্দ্রিক। তার চিন্তা, অনুভূতি ও কাজ সমস্তই ঘটে বস্তুকে কেন্দ্র করে। নিজের প্রেরণা ও উৎসাহকে সরিয়ে নিয়ে সে আরোপ করে বাইরের বস্তুর উপর। এক কথায়, তার কথাবার্তা, চলাফেরা সমস্তই নিয়ন্ত্রিত হয় তার ব্যক্তিগত জীবনের বাইরে যে সামাজিক জীবন তারই আলোকে। কিন্তু অন্তর্মুখীন চরিত্রে দেখা যায় এর ঠিক বিপরীত। তার কাছে সমস্ত কিছুর মূল কথা হলো সে নিজে। তার বাইরের যে বিষয়বস্তু সে তার কাছে গৌণ। এ শ্রেণীর বিশেষত্ব এই যে, কোন নতুন পরিস্থিতির মধ্যে পড়লে প্রথমে সে নিজেকে যেন গুটিয়ে নিয়ে অপসারণ করে। তার সমস্ত ব্যক্তিত্ব তখন যেন এক অনুচ্চারিত অস্বীকৃতি জানাতে থাকে ; এবং এর পরে আস্তে আস্তে দেখা দেয় তার নিজস্ব প্রতিক্রিয়া। সে বাইরের কোন উত্তেজনায় হঠাৎ ধরা দেয় না। প্রথমে সে নিজেকে সামলে নেয় ; তারপর সাড়া দেয়। বিভিন্ন মানুষের সামনে বিস্তৃত রয়েছে একই জগত। কিন্তু সকলেই সে একই জগতকে ঠিক একই ভাবে দেখেনা বা গ্রহণ করে না। কে তাকে কোন ভাবে গ্রহণ করবে, অর্থাৎ জগত তার মনে কোন বিশেষ রূপ ও অর্থ নিয়ে প্রতিবিম্বিত হয়—তা' জানা যায়, তার মধ্যে কোন বৃত্তি প্রধান, তার থেকে। অর্থাৎ জগতকে সে কোন দৃষ্টিতে দেখে তা' জানা যাবে তার বৃত্তিমূলক শ্রেণীবিভাগ থেকে। আর আচরণ বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে শ্রেণীবিভাগ—বহির্মুখীন, ও

অন্তর্মুখীন—তার থেকে জানা যায় জগতের প্রতি তার প্রতিক্রিয়ার বিশিষ্ট রূপটিকে।

প্রত্যেক মানুষই কোন না কোন বৃত্তিগত শ্রেণী ও আচরণ-বৈশিষ্ট্য-মূলক শ্রেণীর অন্তর্গত। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে সে নিজেই এ বিষয়ে মোটেই সচেতন নয়। অথবা, যদি সে সচেতন হয়-ও তবু তার ধারণা ঠিক নয়; নিজের সম্বন্ধেই সে ভুল বুঝেছে। অবশ্য বিষয়টি বিশেষ সহজ নয়। বিশেষতঃ অচেতনার সঙ্গে তার সম্বন্ধ যদি দৃঢ় হয়, তবে সমস্যাটি অধিকতর কঠিন হয়ে ওঠে। বিশেষ করে শিল্পীদের সম্বন্ধে এ অতি সত্য কথা। প্রকৃতপক্ষে শিল্পী, অথবা, যে-কোন সৃজনী-প্রতিভা-সম্পন্ন ব্যক্তিকে সহসা একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। কেননা, অচেতনার সঙ্গে তাদের যোগাযোগ অতি ঘনিষ্ঠ ও প্রত্যক্ষ। শিল্পীর সম্বন্ধে আর একটি উল্লেখযোগ্য কথা এই যে, শিল্পীব্যক্তিকে শিল্পসৃষ্টির সঙ্গে সমীকরণ করা একেবারেই চলে না। প্রায়ই দেখা যায় যে, ব্যক্তি জীবনে হয়তো শিল্পীমন বহির্মুখীন, অথচ সৃষ্টি ব্যাপারে সে সম্পূর্ণ বিপরীত। কেন এমন হয় বুঝতে হলে মনের পরিপূরকনীতিকে স্মরণ করতে হবে। কেননা বহির্মুখীনতা ও অন্তর্মুখীনতা—এরা পরস্পর পরিপূরক। চেতনা যদি হয় বহির্মুখীন, অচেতনা হবে অন্তর্মুখীন। এক শ্রেণীর শিল্পী আছেন যারা, নিজের মধ্যে যে বিশেষ গুণ বা আদর্শের অভাব, সেই গুলিকেই তাদের শিল্পের ভিতর দিয়ে

ফুটিয়ে তোলেন। মনের পরিপূরক নীতির সবচেয়ে পরিষ্কার ও নিঃসন্দেহ প্রকাশ দেখা যায় এইখানে। অবশ্য আবার, এমন শিল্পীও আছেন যাদের সম্বন্ধে এ কথা খাটেনা। তাদের শিল্পে তাদের নিজ চরিত্রের বিপরীত কোন গুণ বা আদর্শই মিলবে না। শিল্প সেখানে শিল্পীরই প্রতিরূপ। এই শ্রেণীর শিল্প দেখা যাবে অন্তর্মুখীনের সৃষ্টিতে। যেমন, সূক্ষ্ম মনোবিজ্ঞানমূলক উপন্যাস। কোন কোন বহির্মুখীনের সম্বন্ধেও একথা প্রযোজ্য। তাদের সৃষ্ট উপন্যাসাদিতে খুব আবেগ-প্রবণ কর্মকুশল বীর নায়কনায়িকারা প্রাধান্য পেয়ে থাকে। বাইরের জগতের সঙ্গে অতি মেলামেশার ফলে বহির্মুখীন শিল্পীর যে অভিজ্ঞতা, উপলব্ধি ও প্রত্যক্ষ দর্শন—তাই তার শিল্পে রূপ নেয়। আবার, অন্তর্মুখীন শিল্পীর ক্ষেত্রে ঘটে এর ঠিক বিপরীত। যেকোন ভাব বা আদর্শ যেখান থেকেই আসুক না কেন তা তার স্বাধীন ও স্বতন্ত্র আদর্শের ভিতর দিয়ে এসে তারই আলোকে বাইরে রূপায়িত হয়।

আমরা আগেই দেখেছি যে, ইয়ুংয়ের মতে অচেতনার মধ্যে দুটি স্তর আছে—ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত (individual ও collective)। ব্যক্তিগত অচেতনা হলো ব্যক্তিগত মানুষের বিস্মৃত অবদমিত চিন্তাভাবনা ইত্যাদির আবাস। ফ্রয়েড বলেছিলেন যে, আমাদের শিশুকালের অতৃপ্ত কামবাসনা অবদমিত হয়ে আশ্রয় নেয় নির্জ্ঞান মনে; আর এই অতৃপ্ত

কামবাসনা আমাদের যার যার নিজ নিজ ব্যক্তিগত জীবনেরই জিনিষ। ইয়ুং যখন ব্যক্তিগত অচেতনার কথা বলছেন তখন তিনি ফ্রয়েডের এই নির্জ্ঞান মনেরই উল্লেখ করছেন। ফ্রয়েডের নির্জ্ঞান মন ও ইয়ুং-য়ের ব্যক্তিগত অচেতনা একই জিনিষ। কিন্তু মনের সংজ্ঞা নির্ণয় করতে গিয়ে ফ্রয়েড চ'লে গেছেন সংজ্ঞান বা চেতনার স্তর অতিক্রম করে নির্জ্ঞান বা অচেতনা পর্যন্ত। এইখানে গিয়েই তিনি থেমে গেছেন। কিন্তু ইয়ুং চলে গেছেন আরও দূরে। তার মনোবিজ্ঞানে অচেতনার স্তর আরও ব্যাপক। নিছক ব্যক্তিগত অচেতনার বাইরে আরও একটা অচেতনা আছে ; সেটা সমষ্টিগত। এর একটা ঐতিহাসিক রূপ আছে। তা বাদে এর মধ্যেও আছে দু'টি স্তর। ব্যক্তিগত অচেতনার ঠিক পরেই হলো এর প্রথম স্তর। এখানে আছে আবেগ আকৃতি জাতীয় মানুষের আদিম কতকগুলি প্রেরণা। যদি এরা কখনও কোন প্রকারে আত্ম-প্রকাশ করে, তাহলে ওদের আয়ত্তে আনা ও সংযত করা হয়তো আমাদের পক্ষে একেবারে অসম্ভব নয়। এর পরের স্তর প্রকৃতপক্ষে অচেতনার স্তর। কেননা এখানকার কোন কিছুই কখনও আত্মপ্রকাশ করেনা ও সব সময়েই আমাদের আয়ত্তের বাইরে। তাদের গতিবিধি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ; এবং তাদের থেকেই জন্ম নেয় নানা প্রকার মানসিক বিকার। অবশ্য মনের যে স্তর বিভাগ এখানে দেওয়া হলো তা একান্ত নয়। কোথায় যে একটা শেষ হয়ে আর একটা আরম্ভ হয়েছে তা বলা প্রায়

অসম্ভব। তবে বিষয়টির মোটামুটি একটি ধারণা করার জন্য ইয়ুং এই বিভাগ করেছেন।

এতোক্ষণ পর্যন্ত আমরা মনের সাধারণ গঠন সম্বন্ধে আলোচনা করেছি ; মনের দুটি বিভাগ এবং সেই বিভাগের মধ্যেই বিভিন্ন স্তর সম্বন্ধে ইয়ুং-য়ের মত আমরা জেনেছি। এখন প্রশ্ন হলো এই যে, অচেতনা যদি এমনই কিছু হয়, যা চেতনার সম্পূর্ণ বাইরে তাহলে তার সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান কি করে সম্ভব ? এবং অচেতনা যদি কখনও চেতনার স্তরে প্রকাশিত হয়, তাহলে তা কি করে হয় ?—এর উত্তরে ইয়ুং বলেন যে, চেতনার স্তরে অচেতনার আবির্ভাবের প্রধান উপায় হলো স্বপ্ন ও গূঢ়ৈষণা (Complex)। সমগ্র ব্যক্তিত্ব থেকে যখন কতগুলি ভাব চিন্তা, অর্থাৎ মানসিক বিষয় বিচ্ছিন্ন হয়ে অচেতনার মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে তখন সেই ঘটনাটিকে বলা হয় গূঢ়ৈষণা। এ অবস্থায় ঐ বিচ্ছিন্ন বিষয়গুলি সম্পূর্ণ স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ; ফলে মানুষের অয়ত্তের বাইরে। এ অবস্থায় মানুষ তার সক্রিয়তা হারিয়ে ভূতগ্রস্তের মতো সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। প্রত্যেকের মধ্যেই গূঢ়ৈষণা আছে। দৈনন্দিন জীবনে আমাদের সাধারণ ভুলভ্রান্তিও এই গূঢ়ৈষণার ফল। গূঢ়ৈষণা থাকিলেই যে মানুষ হীন হবে এমন কোন কথা নেই। গূঢ়ৈষণা থেকে শুধু মাত্র এইটুকু বোঝা যায় যে, মানুষের মধ্যে এমন কিছু আছে যা অসংযত, বিসদৃশ ও পরস্পরবিরোধী। ফলে তারা মনের অগ্রগতির পক্ষে এক প্রকার

বাধাস্বরূপ। কিংবা হয়তো অনেকক্ষেত্রে তারা নবতর সফলতার পক্ষে অধিকতর শক্তিসম্পন্ন প্রেরণা। এদিক থেকে দেখলে গূঢ়ৈষণার বিশেষ মূল্য আছে, এবং আমাদের পক্ষে তাকে বাদ দিয়ে চলা তাই প্রায় অসম্ভব। ইয়ুং সেই জন্য বলেন যে, গূঢ়ৈষণাকে বাদ দিলে আমাদের সমস্ত কর্ম-প্রবাহ থেমে যাবে। যে-কোন মানুষের মধ্যে কোন গূঢ়ৈষণার প্রকৃতরূপ, গভীরতা ইত্যাদি জাগার জন্য ইয়ুং এক বিশেষ উপায় উদ্ভাবন করেছেন। তার নাম হলো ভাবসাহচর্য পদ্ধতি (association of ideas)। বিশেষভাবে নির্বাচিত একশ'টি কথার একটি তালিকা তৈরী করা হয়। তারপর পরীক্ষক একে একে তালিকা থেকে কথাগুলি উচ্চারণ করে যাক। যাকে নিয়ে পরীক্ষা করা হচ্ছে, অর্থাৎ যার গূঢ়ৈষণা বিচার করা হচ্ছে তাকে নির্দেশ দেওয়া থাকে যে, পরীক্ষকের উচ্চারিত এক একটি কথা শুনেই সর্ব প্রথমে তার মনে যে কথাটি ভেসে আসে সে যেন তাই বিনা দ্বিধায় বলে যায়। পরীক্ষকের উচ্চারিত শব্দকে বলা হয় 'উদ্দীপন' শব্দ (Stimulus word) এবং তার উত্তরে ঐ লোকটি যে কথা বলে যায় তার নাম 'প্রতিক্রিয়াশব্দ' (reaction word)। এই দুয়ের মধ্যে কতোটা সময় লেগেছে তার থেকেই পাওয়া যায় গূঢ়ৈষণার পরিচয়। এবিষয়ে আশ্চর্য রকম ফল পাওয়া গেছে। দেখা গেছে যে, যে উদ্দীপন শব্দের সঙ্গে তার অন্তর্নিহিত গূঢ়ৈষণার কোন প্রকার যোগ আছে, তার প্রতিক্রিয়াশব্দ আসতে সময়

লাগে অপেক্ষাকৃত বেশী। একটি উদাহরণ নিলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে। একজন রোগীর কাছ থেকে ইয়ুং এই উপায়ে যে ফল পেয়েছিলেন, তা' এই :—

উদ্দীপনা শব্দ	প্রতিক্রিয়া শব্দ	প্রতিক্রিয়া কাল
১। মাথা	চুল	১'৪ সেকেণ্ড
২। সবুজ	তৃণভূমি	১'৬ "
৩। জল	গভীর	৫'০ "
৪। ছড়ি	ছুরি	১'৬ "
৫। লম্বা	টেবিল	১'২ "
৬। জাহাজ	ডুবে যায়	৩'৪ "
৭। জিজ্ঞাসা	উত্তর	১'৬ "
৮। পশম	বোনা	১'৬ "
৯। বিদ্বেষকারী	বন্ধুভাব	১'৪ "
১০। হ্রদ	জল	৪'০ "
১১। পীড়িত	সুস্থ	১'৮ "
১২। কালি	কালো	১'২ "
১৩। সাঁতার	(সাঁতার) জানি	৩'৮ "

যে-রোগীর কাছ থেকে এই উত্তরগুলি পাওয়া গিয়েছিলো, খবর নিয়ে জানা গিয়েছিলো যে, সে জলে ডুবে আত্মহত্যা করবে বলে স্থির করেছিলো। তার এই গোপন কামনার চমৎকার প্রকাশ এখানে পাওয়া যাচ্ছে। ৩, ৬, ১০ ও ১৩ নম্বরের প্রতিক্রিয়া-কাল লক্ষ্য করলেই তা স্পষ্ট বোঝা যাবে।

এইজন্য ইয়ুং এই প্রতিক্রিয়া-কালের নাম দিলেন। 'গূঢ়ৈষণা নির্দেশক' (complex indicators) ; এবং বললেন যে, প্রতিক্রিয়া কালের দৈর্ঘই যে একমাত্র গূঢ়ৈষণাকে নির্দেশক তা নয়। প্রতিক্রিয়া কালের দৈর্ঘ বাদে, প্রতিক্রিয়ার আরও কয়েকটি লক্ষণ থেকে গূঢ়ৈষণাকে চেনা যেতে পারে। যেমন প্রতিক্রিয়া হিসেবে কোন কথা না বলে একেবারে চুপ করে থাকা। অথবা পরীক্ষক যে উদ্দীপন শব্দটি উচ্চারণ করেছেন, প্রতিক্রিয়া হিসেবে রোগীটিও আবৃত্তি করলো সেই একই শব্দ, নতুন কোন কথা সে বললো না। অথবা, এমনও অনেক সময়ে দেখা গেছে যে, কোন একটি উদ্দীপন শব্দের প্রতিক্রিয়া হিসেবে যে শব্দটি সে ব্যবহার করেছে, ঠিক সেই শব্দটিই সে আবার ব্যবহার করছে অন্য আর একটি সম্পূর্ণ আলাদা জাতীয় উদ্দীপন শব্দের ক্ষেত্রে। অনেক সময়ে আবার হয়তো দেখা যায় যে, পরীক্ষকের উচ্চারিত উদ্দীপন শব্দটি শুনেই রোগীটি ভয়ানক রেগে উঠলো, অথবা অন্য কোন আবেগময় ভাব ফুটে উঠলো তার মধ্যে। এ সবই হচ্ছে বিভিন্ন গূঢ়ৈষণা নির্দেশক।

ভাবসাহচর্যপদ্ধতি বাদে, স্বপ্ন সাহায্যেও আমরা গূঢ়ৈষণা সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানতে পারি। যে সমস্ত বিষয়কে অবলম্বন করে স্বপ্ন আত্মপ্রকাশ করে তা' যেমনি বিচিত্র তেমনই অদ্ভুত। দৈনন্দিন জীবনের ছোটবড় নানা ঘটনা থেকে নিয়ে অচেতনার গভীরতমভাব ইত্যাদিকে অবলম্বন করে সে দেখা

দেয়। এই সমস্ত ভাবের মধ্যে কোন কার্যকারণ সঙ্গতিই খুঁজে পাওয়া যাবে না। তারা দেশকালবহির্ভূত, ও তাদের ভাষা পৌরাণিক (archaic) ও সাংকেতিক (symbolical)। সুতরাং তাদের অর্থ বুঝতে হলে বিশেষ উপায় আবশ্যক। স্বপ্ন থেকে যে আমরা শুধু অচেতন মনের প্রকাশই পাই, তা নয়, তার কর্মনীতিও এখানে দেখতে পাওয়া যায়। তার কারণ স্বপ্ন প্রধানতঃই অচেতনার প্রকাশ। এই অচেনতা শুধু মাত্র ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়—সমগ্র মানবজাতির আদিম প্রকৃতি, এবং এর নাম হলো 'বিষয়গত মন' (objective Psyche)। কী ভাবে বাইরের জগতের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলা যেতে পারে সেই হলো চেতনার লক্ষ্য। কিন্তু অচেতনা সে বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। ব্যক্তিকে অতিক্রম করে তার মধ্যে ব্যক্তির অতীত যে প্রকৃতি তারই সঙ্গে তার যোগাযোগ। কেননা, তার লক্ষ্য হলো মানসিক ক্রিয়া প্রবাহ অক্ষুণ্ণ রাখা। এই দিক থেকে বিচার করলে অচেতনা হচ্ছে মনের একদেশিতার বিরুদ্ধে সতর্কতা। এই সতর্কতা রূপ নেয় স্বপ্নে। কিন্তু অচেতনার আধেয় ও তার অর্থ এত ব্যাপক ও বিচিত্র যে, স্বপ্নের ভিতর দিয়ে প্রকাশিত হবার জন্য তাদের নির্দ্দিষ্ট কোন প্রতীক নেই। স্বপ্ন দ্রষ্টার আভ্যন্তরীণ ও বাইরের পরিস্থিতি অনুসারে স্বপ্নের অর্থ ও তাৎপর্যও বিভিন্ন। অনেক সময়ে এমন হয় যে, স্বপ্নের সঙ্গে স্বপ্ন দ্রষ্টার ব্যক্তিগত জীবনের কোন সমস্যা ও অভিজ্ঞতার কোন সম্বন্ধই খুঁজে পাওয়া যায় না। সেই স্বপ্ন ব্যক্তিসীমা

অতিক্রম করে সমগ্র মানবজাতির চিরন্তন কোন সমস্যার পুনরাবৃত্তি মাত্র।

স্বপ্নের বিষয়বস্তুর বিচার করলে দেখা যাবে যে, শুধুমাত্র ব্যক্তিগত অচেতনা নয়, সমষ্টিগত অচেতনাও সেখানে যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান। যে সমস্ত বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করে অচেতনা, স্বপ্নের ভিতর দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে, তার মধ্যে পৌরাণিক চিত্র ও প্রতিরূপ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মনের অতি গভীর অন্তস্থলে এর জন্ম, এবং ব্যক্তিবিশেষের বাইরে সর্বকালের সর্বমানবের সাধারণ ধর্ম বলে, এর নাম 'আদিম প্রতীক' বা archetype. আদিকাল থেকে মানুষের সমস্ত জ্ঞান অভিজ্ঞতার মূল এই আদিম প্রতীক। দেশকালপাত্রভেদে বিভিন্ন যুগে এর রূপ বদলেছে : কিন্তু অন্তর্নিহিত প্রকৃতিটি সেই একই রয়ে গিয়েছে। অচেতন মনে এর আবাস, এবং আমাদের সমস্ত জ্ঞানের ভিত্তি বলে, এ আমাদের আয়ত্তের বাইরে। একটা অতি সাধারণ উপমা নিয়ে এ বিষয়টি বোঝা যেতে পারে। যে কোন ভাষার একই মূল বর্ণমালাকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠে বিভিন্ন সাহিত্য, কাব্য, দর্শন ইত্যাদি, তেমনই একটি প্রতীক-অবলম্বন করে গড়ে ওঠে আমাদের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা অনুভূতি। মূলে বর্ণমালা এক; বিভিন্ন ব্যক্তিবিশেষের হাতে তারই সাহায্যে গড়ে ওঠে বিভিন্ন সাহিত্য। মূল প্রতীকও এক। আর, এই জন্যেই, অর্থাৎ আমাদের সমস্ত প্রাথমিক অভিজ্ঞতার মূল ভিত্তি বলেই মোটামুটি কয়েকটি নির্দিষ্ট সংখ্যায় একে

ভাগ করা যেতে পারে। কেননা, যে সমস্ত প্রাথমিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে এর আনুষঙ্গ সম্বন্ধ আছে তাদের সংখ্যা মোটামুটি নির্দিষ্ট। 'জননী' এই রকম এক আদিম প্রতীক বা জাতি-রূপ। যতো প্রকারের 'মাতৃভাব' আছে তার সবই এই এক জাতি-রূপের বিভিন্ন বিকাশ। যুগ যুগ থেকে পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত যে জননী-ভাব বর্তমান রয়েছে ব্যক্তি-মাতার মধ্যে সেই-ই হচ্ছে সার্বজনীন মাতা। আদিম জাতিরূপ জননী। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, এই আদিম জাতিরূপগুলিই মানুষের সমস্ত জ্ঞান অভিজ্ঞতার উৎস।

উপরের আলোচনা থেকে যে কথা পাওয়া গেলো, ইয়ুং-য়ের সে কথা যদি মানতে হয় তাহলে এর থেকে আর একটি সিদ্ধান্ত সহজেই এসে পড়ে। অর্থাৎ ইয়ুং-য়ের মনোবিজ্ঞান শুধু মাত্র মনোবিজ্ঞান নয়, জীবন-পদ্ধতি। অভিজ্ঞতার মূল উপাদানগুলি অচেতন মনের গভীরে নিহিত অবস্থায় থেকে আমাদের জীবনের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে থাকে। অচেতনার সীমা থেকে উত্তীর্ণ করে চেতনার মধ্যে তাদের নিয়ে আসাই হচ্ছে মানুষের অন্যতম কর্তব্য। অথবা, অন্যভাবে বলতে গেলে, আমাদের চেতনার বর্তমান সীমাকে আরও প্রসারিত করতে হবে। রবীন্দ্রনাথ যে বলেছেন "জীব চৈতন্য থেকে বিশ্ব চৈতন্যে জন্মগ্রহণ"—এ অনেকটা সেই রকম। আর, এই খানেই ইয়ুং-য়ের মনোবিজ্ঞানের সীমানা। সে হয়ে দাঁড়িয়েছে এক নতুন জীবন-দর্শন।

এ্যাড্লারের ব্যক্তি মনোবিজ্ঞান

আলফ্রেড এ্যাড্লার (Alfred Adler) ছিলেন ফ্রয়েডের অন্যতম প্রথম ও প্রধান সহকর্মী। ফ্রয়েডের মতোই তিনি ছিলেন চিকিৎসক। গোড়ার দিকে ফ্রয়েডের সঙ্গে বক্তিগত পরিচয়ও তার ছিলো না। কিন্তু ফ্রয়েডের কাজকর্ম ও মতবাদের সঙ্গে যথেষ্ট উৎসাহী ও পরিচিত ছিলেন তিনি। এ্যাডলার ছিলেন ভিয়েনায়। সেখান থেকেই তিনি স্বাধীনভাবে নিজের গবেষণা ও মতবাদ প্রচার করতে থাকেন। পরে ফ্রয়েডের সঙ্গে তার পরিচয় ও ঘনিষ্টতা জন্মে। এবং দু'জনে এক সঙ্গে কাজ করতে আরম্ভ করেন। কিন্তু তাদের এই ঘনিষ্টতা ও সহযোগিতা বেশী দিন সম্ভব হলো না। ফ্রয়েডের মতবাদ ও গবেষণা সম্বন্ধে চারিদিকে যখন বেশ একটু সাড়া পড়ে গেছে, এবং সকলেরই দৃষ্টি যখন সে দিকে আকৃষ্ট হতে আরম্ভ করেছে, ঠিক সেই সময়েই দেখা দিলো তার সঙ্গে তার ঘনিষ্ট সহকর্মীদের বিরোধ। তার মতবাদে এই সময়ে দু'টি দাবী করা হয়েছিলো—এক, মানসিক নিয়তিবাদ (psychic determinism) ; ও দুই, মনের সমস্ত অভিব্যক্তির বিশ্লেষণ সম্ভাবনা। প্রথমটির অর্থ হলো এই যে মনের কোন ঘটনাই আকস্মিক বা অর্থহীন নয় ; তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনারও

কোন না কোন কারণ ও অর্থ আছে। এবং সেই কার্যকারণ সূত্রের অলঙ্ঘ্য নীতির দ্বারা আমাদের মনের প্রতিটি তথ্য নিয়ন্ত্রিত। দ্বিতীয়টির দ্বারা বলা হলো যে, মনের যে কোন ভাব বা বৃত্তিকে কার্যকারণের ভিত্তিতে অতি সুন্দর করে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে, এবং এইভাবে তার প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করা আমাদের পক্ষে সম্ভব। এই দু'টি মতের স্বপক্ষে প্রমাণ দিয়েছিলো স্বপ্ন বিশ্লেষণ, দৈনন্দিন জীবনের ভুলভ্রান্তি, মনোবিকার ও উদ্বায়ু-রোগ। এ্যাডলার সাধারণ অর্থে এই দু'টি সিদ্ধান্তকেই স্বীকার করে নিলেন। কিন্তু কার্যকারণ নীতির কারণ-টী, ও বিশ্লেষণের পদ্ধতি সম্বন্ধে ফ্রয়েডের সঙ্গে একমত হতে পারলেন না। দৃষ্টিভঙ্গির এই পার্থক্য ও অনৈক্য থেকেই জন্ম নিলো এ্যাডলারের 'ব্যক্তি মনোবিজ্ঞান' (Individual psychology) ; এবং এ্যাডলার তার মনোবিজ্ঞানের ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করলেন মানুষের অহং-কে (ego)। কেননা, তার মতে মানুষের জীবনের সবচেয়ে প্রধান এষণা বা আকূতি হচ্ছে সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হবার আকূতি, যার ফলে মানুষের একটা স্বাভাবিক প্রচেষ্টাই হলো সকল বাধা অতিক্রম করে নিজেকে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত করা। এই মৌলিক স্বীকৃতি থেকেই তিনি মানুষের মধ্যে অহং-বোধটিকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব'লে মনে করলেন, ও সেই দিকেই অধিকতর জোর দিতে থাকলেন। ফলে, মানুষের যৌনজীবনের চেয়ে এই অহং-য়ের উপর অধিকতর গুরুত্ব

আরোপ করায় তাকে ফ্রয়েডের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আসতে হলো।

প্রথম থেকেই এ্যাডলারের মনে হয়েছিলো যে মানুষের যৌন জীবন-কে ফ্রয়েড যতোটা প্রাধান্য দিতে চান, ততোটা প্রাধান্য তাকে দেওয়া হয়তো ঠিক নয়। অর্থাৎ যৌন বোধই মানব জীবনের প্রধান কথা নয়। এবং ফ্রয়েডের যৌন মতবাদ অসঙ্গত অস্বাভাবিক ও ভুল। কাজেই মানুষের সম্বন্ধে সত্য ধারণা পেতে হলে এ মতবাদকে, বর্জন করতে হবে। অবশ্য নিজের পরীক্ষিত বহু ঘটনার মধ্যে যৌন জীবন সংক্রান্ত বহু জিনিষের সন্ধান এ্যাডলার পেয়েছিলেন, সত্য। কিন্তু তিনি মনে করেন যে, এরও অন্তরালে গভীরতর কোন সত্যের সন্ধানও তিনি পেয়েছেন। মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা ও তাদের পদ্ধতি ইত্যাদি বিশেষভাবে আলোচনা করে এ্যাডলার দেখলেন যে, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই বিশেষ একটি সত্যকে উপেক্ষা করা হয়েছে। মনোবিজ্ঞানের আলোচনায় মানুষের অভিজ্ঞতা, অনুভূতি ইত্যাদিকে বাদ দিয়ে সব সময়েই ধরে নেওয়া হয়েছে যে, মানুষের সমগ্র ব্যক্তিত্ব থেকে কিছু অংশ বিচ্ছিন্ন করে অন্য কোন একটি অংশ নিয়ে আলোচনা করলেই মানুষের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করা সম্ভব। অর্থাৎ ব্যক্তিত্ব-কে বিভিন্ন অংশে ভাগ করা ও তারই ভিত্তিতে পরীক্ষা ও গবেষণা করাই যেন মনোবিজ্ঞানের লক্ষ্য। এ্যাডলার একথা মানতে পারলেন না। তিনি বললেন যে ব্যক্তিত্বকে এভাবে

ভাগ করা কখনই সম্ভব নয়। অথবা ভাগ করলেও তার থেকে কোন সত্যজ্ঞান লাভ করা যেতে পারে না। তাই তার প্রথম স্বীকৃতি হলো ব্যক্তিত্বের ঐক্য। মানুষের বিভিন্ন আচরণ অভিজ্ঞতা ইত্যাদি এই একক ব্যক্তিত্বেরই বিভিন্ন প্রকাশ। কাজেই এই সমস্ত আচরণ অভিজ্ঞতার প্রকৃতি ও সত্যধর্ম যদি উপলব্ধি করতেই হয় তাহলে তা' করতে হবে ঐ অখণ্ড বা একক ব্যক্তিত্বের আলোকে। এ্যাডলার মনে করেন যে, ঐ একক ব্যক্তিত্ব নির্ভর করে বিশেষ একটি লক্ষ্যর উপর। অর্থাৎ মানুষের জীবনে আছে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য বা আদর্শ (goal), এবং তার সমস্ত আচরণ, ব্যবহার, কর্ম নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে এই আদর্শ বা লক্ষ্যে পৌছুবার জন্য। কোন একটি লোক হয়তো নিতান্ত দুঃখ ও নৈরাশ্যের ভিতর দিয়ে দিন কাটাচ্ছে, কিন্তু তবু সাধারণতঃ এটা আমরা কিছুতেই মনে করতে পারবো না যে 'গাছ' শব্দটির সঙ্গে 'দড়ি' শব্দটির কোন স্বাভাবিক ভাবানুষঙ্গ তার মনে থাকতে পারে। কিন্তু যদি আমরা জানতে পারি যে, সেই লোকটি আত্মহত্যা করবে বলে স্থির করেছে, তাহলে ওরকম ধারণা সহজেই আমাদের মনে আসতে পারে। এবং সেক্ষেত্রে আমরা সমস্ত রকম সম্ভাব্য মারাত্মক জিনিষপত্র তার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে একটুও দেরী করব না। এই জাতীয় দৃষ্টান্ত থেকে এ্যাডলার বলতে চান যে মানুষের জীবনে, অন্য কিছু থেকে তার লক্ষ্যটিই প্রধান। এই লক্ষ্য যদি না থাকতো, তাহলে প্রত্যেকটি মানুষই নিজেকে নিয়ে

অত্যন্ত বিব্রত হয়ে পড়তো। কেননা নির্দিষ্ট কোন লক্ষ্য না থাকায় তার কর্ম আচরণেরও কোন শৃঙ্খলা বা সঙ্গতি থাকতো না। আর, এর থেকেই প্রমাণ করা যেতে পারে যে, সম্পূর্ণ লক্ষ্যহীন হয়ে কখনই কোন চিন্তা, ভাবনা, অনুভূতি, সঙ্কল্প ইত্যাদি আমাদের মধ্যে সম্ভব হতে পারে না।

অত্যন্ত সাধারণভাবে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের দিকে তাকালেই দেখা যাবে যে, যেখানে কোন একটি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে কোন কাজ আরম্ভ করি, আমাদের চলাফেরা কথা-বার্তা সেখানে বিশেষ একটি অর্থ নিয়ে সুসঙ্গত ও সুসংহত হয়ে উঠে। আসন্ন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে এরকম একটি ছাত্রের দিকে তাকালেই এর সত্যতার প্রমাণ পাওয়া যাবে। এ্যাডলার বলেন যে, ঠিক এই একই ভাবে প্রমাণ করা যেতে পারে যে আমাদের সমস্ত মনোবৃত্তিও পরিচালিত হচ্ছে একটি পূর্বনির্দিষ্ট লক্ষ্যকে উদ্দেশ্য করে। ব্যক্তিগত ভাবে একজনের লক্ষ্যের সঙ্গে অন্য আর একজনের লক্ষ্যের সঙ্গে কোন মিলই হয়তো দেখা যাবে না। কিন্তু এই সমস্ত বিভিন্ন সাময়িক লক্ষ্যগুলি চূড়ান্ত বা আসল নয়। সাময়িক লক্ষ্যের বাইরে, আর একটি লক্ষ্য আছে যা স্থায়ী ও সমস্ত মানুষের মধ্যেই তা চূড়ান্ত ও প্রধান।

এ্যাডলার বলেন, মানুষের মধ্যে এই যে লক্ষ্য, এর সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ সচেতন থাকতে হবে। কেননা, মানব জীবনের গোড়ার কথাই হচ্ছে এই লক্ষ্য বা আদর্শ। সাধারণ

ভাবে দেখতে গেলে হয়তো কোন লক্ষ্যই আমরা সেখানে দেখতে পাবো না। কিন্তু আমাদের মধ্যে যখন কোন সামাজিক বৃত্তি তার স্বাভাবিক অবস্থা থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে, তখন তাকে বিশ্লেষণ করলেই এর সম্বন্ধে আমরা জানতে পারবো। মনে করা যাক, কোন এক ব্যক্তির স্মৃতিশক্তি যতোটা প্রবল থাকা উচিত ছিলো বাস্তবে তার স্মৃতিশক্তি তার চেয়ে অনেক দুর্বল। এই দুর্বলতার কারণ আমরা বলবো, মস্তিষ্ক ও স্নায়ুগত। কিন্তু এ্যাডলারের ব্যক্তি-মনোবিজ্ঞান বলছে যে এক্ষেত্রে ব্যক্তিটির এমন কোন একটি উদ্দেশ্য আছে, যার জন্য স্মৃতিশক্তি প্রবল না হওয়াই তার পক্ষে সুবিধাজনক। কাজেই এই দৌর্বল্য উদ্দেশ্যমূলক। এবং যতোক্ষণ পর্যন্ত সমগ্র ব্যক্তিটির সম্বন্ধে সুস্পষ্ট জ্ঞান আমরা না পাচ্ছি ততোক্ষণ সেই উদ্দেশ্য সম্বন্ধেও আমরা জানতে পারছি না। কেননা সমগ্রের জ্ঞান থেকেই আসে অংশের জ্ঞান। সুতরাং যদি ঐ ব্যক্তিটির অন্তর্নিহিত জীবন পরিকল্পনাটি জানা যায় তাহলে দেখা যাবে যে তারই প্রভাবে ঘটছে তার এই স্মৃতিদৌর্বল্য। এর থেকে এ্যাডলার এই সিদ্ধান্ত করলেন যে ব্যক্তিমনের লক্ষ্য অথবা তার জীবন পরিকল্পনাটি জানতে পারলেই দেখা যাবে যে, তার সমস্ত কর্ম আচরণ ইত্যাদি, আপাত দৃষ্টিতে যাকে বিচ্ছিন্ন বলে মনে হয়, তা ঐ লক্ষ্য ও জীবনপরিকল্পনার সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ। সুতরাং মনোবিজ্ঞানের আলোচনায় বিশেষ কোন পরিবেশ অথবা অভিজ্ঞতাকে জানার চেয়ে অধিকতর

প্রয়োজনীয় হচ্ছে এই আদর্শ বা লক্ষ্য। এবং ব্যক্তি মনোবিজ্ঞানের মতে সে আদর্শ হচ্ছে আত্মগরিমা বা বড়ো হবার সঙ্কল্প। অবশ্য কে কোন দিকে কী ভাবে বড়ো হতে চায়, এবং তার বড়োত্বের ধারণা কী, সেটা নির্ভর করে অনেকটা তার পারিপার্শ্বিক ও অন্যান্য সাময়িক স্থানীয় ও ব্যক্তিগত কারণের উপর। কিন্তু যে কোন রূপ নিয়ে যে কোন দিক থেকেই হোকনা কেন, এই বড়ো হবার সঙ্কল্পই হচ্ছে মানব জীবনের মূল প্রেরণা। আর আমার সমস্ত আচরণ, কর্ম, প্রচেষ্টা ইত্যাদি যখন সেই নির্দিষ্ট আদর্শকে লক্ষ্য করে নিয়ন্ত্রিত হয় তখনই তাকে বলা হয় জীবনপরিকল্পনা। কোন একজন লোক হয়তো শিল্পী হতে চায়, অথবা ঈশ্বরোপলব্ধি করতে চায় ; এ সবেরই মূলে দেখা যাবে এই আত্মগরিমাবোধ বা বড়ো হবার সঙ্কল্প।

প্রশ্ন হতে পারে যে, এই আত্মগরিমাবোধ আসে কোথা থেকে ? তারও উত্তর এ্যাডলার দিয়েছেন। তিনি বলেন যে, মানুষের এক হীনতা-বোধ (inferiority complex)ই হচ্ছে এর উৎস। এই হীনতা-বোধ মানুষের জন্মগত। জন্মের পর থেকেই মানবশিশু তার শারীরিক অপরিণত অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে। কোন কিছুই তার নিজের দ্বারা সম্ভব হয় না। সমস্ত কাজের জন্যই তাকে নির্ভর করতে হয় অন্যের উপর। ফলে তার মধ্যে দেখা দেয় পরাধীনতার বেদনা, আত্ম-অবিশ্বাস, ও অক্ষমতাবোধ। তার যতো কান্না, অস্থিরতা ও বিভিন্ন খেলা ইত্যাদির মূলে রয়েছে এই অক্ষমতা ও

অসহায়তা বোধ। ফলে সে কল্পনা করে এমন একটা অবস্থা যেখানে তার সমস্ত বাধা সমস্ত অক্ষমতা দূর হয়ে গেছে; যেখানে সে স্বাধীন, ও সব কিছুর উর্ধ্বে; যেখানে সে মহান ও সার্থক। এইভাবে, অতি শিশুকাল থেকে মানুষের মধ্যে জন্ম নেয় এক উচ্চ আদর্শ ও লক্ষ্য। বাস্তবের সঙ্গে কোন সম্বন্ধই এই আদর্শের নেই। এ আদর্শ সম্পূর্ণ কল্পিত। তবু এরই মধ্যে সে খুঁজে পায় তার হীনতাবোধ জনিত দুঃখের সান্ত্বনা।

এই হীনতাবোধের জন্য যে একমাত্র জন্মগত স্বাভাবিক অসহায়তাই দায়ী তা' নয়। এর সঙ্গে মাঝে মাঝে যোগ দেয় শারীরিক বা দৈহিক বিকৃতি—যেমন ট্যারা চোখ, তোৎলামি ইত্যাদি। শিশুজীবনে মানুষের অসহায়তা-বোধ যতো বেশী, দৈহিক অথবা মানসিক দুর্বলতার জন্য তাকে কষ্ট পেতে হয় ততো বেশী; এবং জীবনে যতো বেশী সে অনাদৃত, তার আদর্শ বা লক্ষ্য স্থিরীকৃত হয়ে থাকে, ঠিক ততো বেশী উচ্চে। কাজেই যে সমস্ত ব্যক্তি সেই আদর্শের দিকে অগ্রসর হতে থাকে, ও সেই আদর্শকে লক্ষ্য করে নিজের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে, তাদেরই আমরা বলি প্রতিভা সম্পন্ন ও তাদেরই আমরা দেখি বিশেষ কোন বিষয়ে অনন্য-সাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করতে। এই ভাবে বিশেষ কোন কৃতিত্ব ও উল্লেখযোগ্য সাফল্যের দ্বারা সে নিজের হীনতা-বোধকে অতিক্রম করে আসে। দৃষ্টান্ত হিসেবে আমরা

উল্লেখ করতে পারি বহু ব্যায়ামবীরের জীবনী। অনেকেই এদের ছোটবেলায় ছিলেন অত্যন্ত ক্ষীণকায় ও দুর্বল। হয়তো বন্ধুবান্ধবেরা এর জন্য খুব ঠাট্টা করতো, কিংবা কেউ হয়তো কোন দিন এদের অপমান করেছিলো, তারপর থেকে নিয়মিত ব্যায়াম করে শেষ পর্যন্ত হয়ে উঠ্‌লেন অপরূপ দেহধারী অসীম শক্তিমান পুরুষ। অনেক সময়ে আবার এই সাফল্য আসে অন্যদিক থেকে। অর্থাৎ কোন লোক যে বিষয়ে হীন, সে সফল হয়ে ওঠে সেই বিষয় বাদে অন্য কোন বিষয়ে। যেমন, যে কানে শোনেনা, সে হ'য়ে ওঠে এক শিল্পী, অথবা যে চোখে দেখেনা সে হয়ে ওঠে একজন গায়ক। আবার এমনও অনেক সময়ে হতে পারে যে, নিজের অক্ষমতা, দুর্বলতা ও তার ফলে হীনতাবোধকে অতিক্রম করা কোন কারণে হয়তো সম্ভব হয়ে উঠলো না। মানুষ তখন আশ্রয় নেয় নিছক কল্পনার, গড়ে তোলে এক কল্পিত লক্ষ্য, এবং এই লক্ষ্যের আলোকেই সে তখন তার সমস্ত আচরণ ইত্যাদি নিয়ন্ত্রিত করতে থাকে। ফলে দেখা দেয় বাস্তব জীবনের সঙ্গে তার কল্পিত জীবনের অসঙ্গতি। বাস্তব জীবনের কোন দাবীই সে পূরণ করতে পারে না। কিন্তু তার এই অক্ষমতাকে সে ব্যাখ্যা করে এই ভাবে : যদি আমার এতো অশান্তি না থাক্‌তো, যদি আমি অসুস্থ না হতাম, তাহলে অন্যান্য সকলের মতো আমিও কিছু করতে পারতাম। যদি আমাকে এতো বেশী বিরুদ্ধ ও প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন না হতে হতো,

তাহলে আমি নাম যশ লাভ করতে পারতাম। এই জাতীয় চিন্তা যুক্তি দ্বারা সে তখন নিজের অক্ষমতাকে ঢাকতে চেষ্টা করে, ও এক প্রকার আত্মপ্রবঞ্চনার দ্বারা নিজেকে বড়ো মনে করতে থাকে। এবং নিজের ব্যর্থতাকে সমর্থন করার জন্য সব সময়েই সে নানাপ্রকার বাধা ও অসুবিধার খোঁজ করতে থাকে। এই অবস্থাকেই এ্যাড্‌লার বলেন উদ্বায়ুরোগ। ফ্রয়েডেরই মতো এ্যাড্‌লারও বলেন যে, প্রত্যেকটি উদ্বায়ু-রোগ বা মানসিক বিকারই উদ্দেশ্যমূলক। অর্থাৎ বিশেষ কোন কামনা যখন বাস্তব জগতে স্বাভাবিক ভাবে চরিতার্থতা লাভ করতে না পারে, তখনই দেখা দেয় উদ্বায়ুর সম্ভাবনা। কিন্তু ফ্রয়েড যেখানে সেই কামনাটিকে বলেন কামজ, এ্যাড্‌লার সেখানে বলেছেন, বড়ো হবার সঙ্কল্প, যার ভিত্তি হচ্ছে হীনতাবোধ।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, কিবা সাধারণ মানুষের জীবনে, কিবা উদ্বায়ুরোগগ্রস্তের জীবনে, এই হীনতাবোধই হচ্ছে মূলকথা। এই মৌলিক প্রেরণা থেকেই মানব জীবনে আসে আদর্শ বা লক্ষ্য, এবং তা' স্থিরীকৃত হয়ে যায় অতি শিশুকাল থেকে। কিন্তু এই আদর্শ, বা, তাকে কেন্দ্র করে যে জীবন-পরিকল্পনা, সকলের জীবনে তা' এক নয়। প্রত্যেকের আদর্শের মধ্যে নিজস্ব একটি বৈশিষ্ট্য আছে। এর কারণ, এ্যাড্‌লার বলেন, পারিবারিক পরিবেশের মধ্যে ব্যক্তি-জীবনের স্থান। বাড়ির প্রথম ছেলের মানসিক গঠন, মনোবৃত্তি ও বৈশিষ্ট্য

যা হবে, দ্বিতীয় অথবা সবচেয়ে ছোট ছেলের তা হবে না। অথবা যে ছেলে বাড়ির মধ্যে এক মাত্র সন্তান, কিংবা যে বাড়িতে শুধুই কয়েকটি ছেলে কিংবা শুধুই কয়েকটি মেয়ে— এরকম সমস্ত ক্ষেত্রেই একের মনের গঠন অন্যের থেকে আলাদা। সাত ভাই চম্পার পারুল বোনের মনের গঠন যা হবে, রামবাবুর পরপর অষ্টম কন্যা 'আন্নাকালি'-র মনের গঠন সে রকম হবে না। কাজেই মানুষের জীবন-পরিকল্পনা ও আদর্শকে যদি জানতে হয়, তাহলে পারিবারিক পরিবেশের মধ্যে তার স্থান কি, তাও আমাদের জানা দরকার। সাধারণতঃ দেখা যায় যে, বড়ো ছেলের প্রকৃতির মধ্যে থাকে—'আমি সবার বড়ো, সবাই আমাকে মান্য করবে এই জাতীয় একটা মনোভাব। রক্ষণশীলতা ও সামাজিকতা তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সাধারণতই দেখা যায় যে বড়ো ছেলেই বেশ হিসেবী, বিবেচক, সামাজিক, দায়িত্ব সম্পন্ন। আবার, পারিবারিক পরিবেশের মধ্যে যে ছেলে দ্বিতীয়, তার চেয়ে বড়ো আর একজন রয়েছে, এবং সেই অগ্রজের স্বাধীনতা, ক্ষমতা তার নিজের চেয়ে বেশী। যে সমস্ত বিষয়ে দ্বিতীয়ের কোন অধিকার নেই, প্রথমের তাতে আছে। কাজেই এ্যাড্লার বলেন যে, দ্বিতীয় জনের মধ্যে যদি কোন প্রচেষ্টা দেখা যায় তবে সে হবে তার অগ্রজকে ছাড়িয়ে যাবার প্রচেষ্টা। এই প্রচেষ্টায় সে তার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করবে, এবং যে কোন দিক থেকে তার অগ্রজকে ছাড়িয়ে যেতে পারলেই

সে শান্তি পাবে। যে সমস্ত উদ্বায়ুরোগগ্রস্ত রোগী অত্যন্ত বেশী অস্থির, তাদের মধ্যে অধিকাংশই দেখা যাবে বাড়ির দ্বিতীয় সন্তান। প্রথম অথবা দ্বিতীয় সন্তানের চেয়েও বিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছে কনিষ্ঠ সন্তান। কনিষ্ঠ সন্তানের মধ্যে সাধারণতঃই থাকে কিছুটা সঙ্কোচ, দ্বিধা, ও ইতস্ততঃ ভাব। অন্যেরা যে সমস্ত কাজ করতে পারে, ও করে, তার পক্ষেও যে সে সব করা সম্ভব একথা সহজে সে বিশ্বাস করতে পারে না। নিজেকে অত্যন্ত অসহায় বোধ করতে থাকে সে। কেননা, যেদিকেই সে তাকায়, সেদিকেই সে দেখে তার চেয়ে বড়োরা। সকলেই তার চেয়ে বড়ো ও কাজের লোক। তার নিজের যেন কোন গুরুত্বই নেই। সে শুধু অন্যের আদর ও স্নেহই পেতে পারে। এর পরিবর্তে তার কিছু বলারও নেই, দেবারও নেই। নিজের কোন কাজের জন্যই তাকে কিছু করতে হয় না। কেননা সকলেই তাকে ভালোবাসে। কাজেই সকলের ভালোবাসা পরিচর্যা পেতেই সে অভ্যস্ত। কিন্তু অন্যের কাছে সে যে প্রয়োজনীয়, তার নিজের যে কোন গুরুত্ব আছে, সেইটে সে কিছুতেই বোধ করতে পারে না। তার চেয়ে যারা বড়ো, তাদের সঙ্গে তুলনায় নিজেকে সে অকর্মন্য ও হীন বোধ করতে থাকে। এই বোধ থেকেই দেখা দেয় তার বড়ো হবার সঙ্কল্প।

যে-হীনতা-বোধ থেকে শিশু-মনে দেখা দেয় বড়ো হবার সঙ্কল্প তার সম্বন্ধে সাধারণ যে কথা আমরা আলোচনা

করেছি, তা বাদেও শিশু-জীবনে আর একটি বৈশিষ্ট্যের কথা এ্যাড্‌লার উল্লেখ করেছেন। তার নাম হচ্ছে 'পৌরুষ বোধ' (masculine protest)। অতি শিশুকাল থেকে মানুষ পুরুষ ও নারীর মধ্যে পার্থক্য। বুঝতে শেখে, অবশ্য প্রবীণরা যে অর্থে এই পার্থক্য বোঝেন, শিশু ঠিক সে অর্থে বোঝে না। তবু দুটো শ্রেণী বিভাগ সে সহজেই করে নেয় শক্তি, মহত্ব, ঐশ্বর্য, জ্ঞান, রুক্ষতা, নির্মমতা, সক্রিয়তা ইত্যাদি গুণগুলিকে সমস্ত শিশুরাই গ্রহণ করে পুরুষ অর্থে। এবং এদের বিপরীত গুণগুলিকে গ্রহণ করে নারী অর্থে। কাজেই শিশুকাল থেকে মানুষের পরনির্ভরতা ও অসহায়তাবোধ; তাতে সে নিজেকে অপমানিত ও হীন বোধ করতে থাকে; কেননা তাতে পৌরুষ নেই। এ মনোভাব যে শুধু ছেলেদের মধ্যেই দেখা যায় তা' নয়। এ্যাড্‌লার বলেন যে মেয়েরাও ঠিক এই একই মনোবৃত্তি সম্পন্ন। সাধারণ শিশুদের মধ্যে থাকে কতকগুলি স্বাভাবিক পরিস্থিতি। যেমন, পরনির্ভরশীলতা, দুর্বলতা, একাকিত্বের ভয় এবং অনেক ক্ষেত্রে শারীরিক বিকৃতি ও ত্রুটিজনিত সঙ্কোচ ও বেদনা। এর ফলে, নিজেকে সে সম্পূর্ণ পুরুষ বলে মনে করতে পারে না। মেয়েরাও ঠিক এই একই কারণে নিজেকে ঠিক সম্পূর্ণ মানুষ বলে ভাবতে পারে না। ফলে শিশুর জীবনে দেখা দেয় পারিপার্শিকের বিরুদ্ধে এক প্রবল প্রতিবাদ; এবং শিশুটি হয়ে দাঁড়ায় অবাধ্যতা ও উগ্রতার এক বাস্তব প্রতিমূর্তি। একেই

এ্যাড্‌লার বলেন পৌরুষবোধ। ব্যক্তিমনোবিজ্ঞানের মতে মানুষের জীবনে এই পৌরুষবোধ একটি বিশেষ লক্ষ্যণীয় বিষয়। এ্যাডলার বলেন যে, অধিকাংশ উদ্বায়ুরোগের মূলেও দেখা যাবে এই পৌরুষবোধ।

তা'হলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, মানুষের জীবনে দু'টি জিনিষ সমানভাবে কাজ করে চলেছে। একদিকে যেমন রয়েছে অনিবার্য কোন হীনতা-বোধ, তেমনি অন্যদিকে রয়েছে সেই হীনতাকে অতিক্রম করে বড়ো হবার সঙ্কল্প। এই দুই প্রান্তের মাঝখানে বিস্তৃত রয়েছে মানুষের জীবন। তার গতি তাই একমুখী। ফ্রয়েডের মতে চেতনা ও অচেতনা পরস্পর বিরোধী। অচেতনা যা চায়, চেতনা তা চায় না। তাই তাদের মধ্যে লেগে থাকে দ্বন্দ্ব। অচেতনা চায় নিজেকে প্রকাশ করতে, চেতনা চায় তাকে দমন করতে। তাই সেখানে দেখা দেয় অবদমন। কিন্তু এ্যাডলারের মনোবিজ্ঞানে তা নয়। চেতন মনের যে কামনা যে প্রেরণা, অচেতন মনেরও সেই কামনা সেই প্রেরণা। দুয়েরই লক্ষ্য এক। যে হীনতাবোধ মানুষের মূল প্রেরণা, সে জিনিষটা আমাদের জীবনে এত স্বাভাবিক যে অতি পরিচয়ের ফলে তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রায়ই আমরা সচেতন নই। কাজেই বলা যেতে পারে যে, হীনতাবোধ আমাদের অচেতন মনের প্রেরণা। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, সেই প্রেরণার সঙ্গে অচেতন মনের প্রচেষ্টার কোন বিরোধ তো নেই-ই, বরং সচেতন মনের প্রচেষ্টা তার সেই হীনতা-বোধেরই এক অঙ্গ।

আমরা আগেই দেখেছি যে, ফ্রয়েডের যৌন মতবাদ এ্যাডলার মেনে নিতে পারেন নি। কিন্তু তাই বলে, যৌনবোধ যে জীবনের একটি গুরুতর বিষয়, একথা তিনি অস্বীকার করেন না। তিনি শুধু বলেন যে, মানুষের মূল প্রেরণা হচ্ছে বড়ো হবার প্রেরণা। এবং যৌন-বোধ হচ্ছে সেই মূল প্রেরণার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত যে জীবন-পরিকল্পনা, তারই এক অংশ মাত্র। কাজেই যৌন-মতবাদের দ্বারা মানুষের জীবনের যে ব্যাখ্যা-প্রচেষ্টা তা সত্য হতে পারে না। অংশকে সমগ্রের মর্যাদা দিয়ে গুরুতর ভুল করেছেন ফ্রয়েড।

ফ্রয়েড এবং অন্যান্য এষণাবাদীদের মতো, এ্যাডলারও এষণাবাদী ; এবং মানসিক কার্যকারণ নীতিতে বিশ্বাসী। কিন্তু কারণের সংজ্ঞা বিষয়ে ফ্রয়েডের থেকে পৃথক। তার মতবাদ কতোটা সত্য, কতোটা ভুল সে প্রশ্ন বাদ দিলেও এটা স্বীকার করতেই হবে যে, এ মতবাদ অপেক্ষাকৃত সহজবোধ্য, ও সহজ প্রযোজ্য। বিশেষতঃ শিশুদের শিক্ষা বিষয়ে এ্যাডলারের মতবাদ আশ্চর্য রকম কার্যকরী এবং বোধহয় এই থেকেই তার মূল্য সবচেয়ে বেশী।

উইলিয়াম ম্যাক্‌ডুগালের এষণাবাদ

আধুনিক মনোবিজ্ঞানে যে সমস্ত গবেষণাকারী ও নেতারা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তাঁদের মধ্যে মার্কিন অধ্যাপক ম্যাক্‌ডুগাল (William McDougall)-এর প্রবর্তিত এষণাবাদী মনোবিজ্ঞান (Hormic Psychology) সম্ভবতঃ আমাদের সাধারণ জনসমাজে অপেক্ষাকৃত কম পরিচিত। আধুনিক মনোবিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার মতো ম্যাক্‌ডুগালের মনোবিজ্ঞানও জন্ম নিয়েছিলো বিদ্রোহের মাঝ দিয়ে। বিশুদ্ধ চেতনা বা সচেতন মনের বিশ্লেষণ ও আলোচনা করাই যে মনোবিজ্ঞানের একমাত্র কর্তব্য, ও সার্থকতা—গত যুগের এই মতবাদ ম্যাকডুগাল অস্বীকার করলেন। মানুষ শুধু মাত্র ব্যক্তিগত মানুষ নয়; তার প্রত্যেক আচরণ ইত্যাদির একটি সমষ্টিগত সামাজিক তাৎপর্য বা মূল্য আছে। কাজেই তার সম্বন্ধে যে কোন আলোচনাই হোক না কেন, সেই আলোচনাকে পরিচালিত করতে হবে এই দিক থেকে। মানুষের কর্ম আচরণ ব্যবহার ইত্যাদি,—যা নাকি গড়ে ওঠে ব্যক্তিগত মানুষ ও সমষ্টি-গত সমাজের সংযোগ ও প্রতিক্রিয়ার ফলে,—তার মূল স্বরূপ নির্ণয় করাই হলো মনোবিজ্ঞানের কর্তব্য। চেতনার বিশ্লেষণ, আত্মা ও মনের সম্বন্ধ, কাল ও দেশের প্রত্যয় ইত্যাদি তত্ত্বের আলোচনা

প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান হলেও একদিক থেকে তা অর্থহীন। কেননা, সেই বিশুদ্ধ তত্ত্বকে যদি কার্যকরী করা না যায় মানুষের বৃহত্তর জীবনে, তাহলে আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থ। ম্যাক্‌ডুগাল তাই বলেন যে বিশুদ্ধ তত্ত্বকে বাদ দিয়ে তার থেকে সংকলিত যে নীতিসমূহ সামাজিক মানুষের পারস্পরিক সম্বন্ধ আচরণ ব্যবহার ইত্যাদি বুঝতে সাহায্য করবে, এবং যার দ্বারা সমগ্র জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করা চলবে বিভিন্ন অবস্থার মাঝ দিয়ে—মনোবিজ্ঞানের চর্চায় তাদেরই স্থান হওয়া উচিত সর্বাগ্রে। এর জন্য অমাদের সর্বপ্রথম প্রয়োজন হচ্ছে মানব জীবনে কর্মের মূল উৎস অনুসন্ধান করা। মানুষের সমস্ত দৈহিক ও মানসিক কার্যের প্রেরণা জোগায় ও সমগ্র আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে, মানব জীবনে এমন কিছু আছে কি না ; এবং থাকলে তা কি—এই হলো ম্যাক্‌ডুগালের মনোবিজ্ঞানে গোড়ার প্রশ্ন। ম্যাক্‌ডুগাল দেখলেন যে প্রচলিত কোন মনোবিজ্ঞানে এ প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যাচ্ছে না। একে একে সব মতবাদেরই আলোচনা করলেন তিনি ; এবং বিশেষ করে আলোচনা করলেন দুটি মতবাদের—(১) পদার্থবিদ্যা, রসায়ন শাস্ত্র ও শরীরবিদ্যার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে মনের যে যান্ত্রিক ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা চলেছিলো (mechanistic psychology) তার ; ও (২) আচরণবাদের। কিন্তু কোনটাই তিনি গ্রহণযোগ্য মনে করলেন না। তার প্রধান আপত্তি হলো এই যে, এরা মানুষকে এনে ফেলেছে এক যন্ত্রের পর্যায়ে। কিন্তু বাস্তবিকই

কি মানুষ একটি যন্ত্র? সেক্স্পিয়র, বীঠোভেন, নিউটন, আইনষ্টাইনের কাছ থেকে যে জিনিষ আমরা পেয়েছি তা কি নেহাৎই যান্ত্রিক? ম্যাক্ডুগাল বললেন, না, যান্ত্রিক মনোবিজ্ঞান দিয়ে এ সবের ব্যাখ্যা হয় না। তার কারণ মানুষের কোন আচরণ কর্মই অন্ধ বা উদ্দেশ্যহীন নয়। প্রত্যেক আচরণ কর্মেরই একটি লক্ষ্য (goal) আছে। এই লক্ষ্যকে লাভ করার প্রেরণাই হচ্ছে মানব জীবনের ভিত্তি।

যান্ত্রিক মনোবিজ্ঞান ও আচরণবাদ এই সত্যটিকে স্বীকার করেনি তার কারণ "আচরণ" জিনিষটিকেই তারা বোঝেনি ভালো করে। আচরণের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। (১) আচরণ শব্দটিই জীবন-সূচক। একখণ্ড পাথর সম্বন্ধে এ শব্দ আমরা ব্যবহার করি না; কিন্তু মানুষের সম্বন্ধে করি। তার কারণ পাথর নিস্প্রাণ ও নির্জিব। আর মানুষ সজীব ও প্রাণবান। (২) মূল উদ্দীপন-নিরপেক্ষ হয়ে আমাদের প্রতিক্রিয়া-আচরণের দীর্ঘকালব্যাপী স্থায়িত্ব। যদি স্বীকার করে নেওয়াও যায় যে, প্রত্যেক আচরণ হচ্ছে নির্দিষ্ট একটি উদ্দীপনের প্রতিক্রিয়া মাত্র, তাহলেও দেখা যাবে যে, নির্দিষ্ট উদ্দীপনটি অন্তর্হিত হয়ে যাওয়ার পরও বহুক্ষণ পর্যন্ত তার প্রতিক্রিয়াটি সক্রিয় থাকে। (৩) উদ্দীপনাটি চলে যাবার পর যখন প্রতিক্রিয়াটি কাজ করতে থাকে তখন তার গতিপথ সম্বন্ধে আগের থেকে নির্দিষ্ট করে কিছু বলা যায় না। একটা বলকে যদি ধাক্কা দেওয়া যায় তাহলে সে গড়িয়ে যেতে থাকবে। যতোক্ষণ

পর্যন্ত অন্য কোন শক্তির সঙ্গে সংঘাত না হয় ততোক্ষণ পর্যন্ত সে চলতে থাকবে একটা নির্দিষ্ট পথে। কিন্তু সজীব পদার্থের ক্ষেত্রে এ নিয়ম খাটে না। (৪) উদ্দীপন-নিরপেক্ষ স্বাধীন প্রতিক্রিয়া-আচরণ চলতে চলতে যখনই বিশেষ একটি পরিবর্তিত পরিবেশের সম্মুখীন হবে তখনই সে থেমে যাবে। এই বিশেষ পরিবর্তিত পরিবেশের সম্মুখীন হলে প্রতিক্রিয়াটি থেমে যাবে—শুধুমাত্র এইটুকুই আগে থেকে আমরা বলতে পারি। কিন্তু কি ভাবে কোন পথে সে যাবে সে আমরা জানি না। যেমন, একটা ইঁদুরকে যদি তাড়া দেওয়া যায়, তাহলে সে তার গর্তের দিকে ছুটতে থাকবে। ছুটে চলার সময়ে যদি দেখে ঘরের দরজাটি বন্ধ, তাহলে ঘুরে এসে সে ছুটবে জানালার দিকে ; সেখানেও যদি বাধা পায় তাহলে এদিক ওদিক করতে থাকবে। অবশেষে গর্তে প্রবেশ করে শান্ত হবে। (৫) অনেক ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া-আচরণের মধ্যে আর একটি জিনিষ দেখা যায়—সে হচ্ছে একপ্রকার প্রস্তুতি। যেমন, বাড়িতে যদি হঠাৎ কোন আগন্তুক অথবা অপরিচিত কোন কিছু উপস্থিত হয় তাহলে বাড়ির কুকুরটির মধ্যে দেখা যাবে এক প্রকার সন্দেহ, ও সম্ভাব্য প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে আক্রমণের জন্য সর্বশরীরের মধ্যে এক প্রকার সতর্কতা।

এই যে পাঁচটি লক্ষণ, এর থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, আচরণ জিনিষটি শুধুমাত্র দেহগত যান্ত্রিক ব্যাপার নয়। প্রত্যেক আচরণের পিছনে বর্তমান রয়েছে একটি মনোজগত

বা মন। আচরণের অন্য লক্ষণ থেকেও এই মনের অস্তিত্ব অনুমান করা যায়। যেমন (৬) যখন কোন প্রতিক্রিয়া বার বার অনুষ্ঠিত হতে থাকে, তখন প্রতি অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে তার মধ্যে কিছু পরিমাণ উন্নতি দেখা যায়। অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট একটা সমাপ্তিতে পৌছবার পূর্ব পর্যন্ত আচরণকে যে সমস্ত বিভিন্ন স্তর পার হয়ে আসতে হয়, প্রতি অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি সংক্ষিপ্ত ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে আসতে থাকে। এই লক্ষণগুলি থেকে বোঝা যাবে যে মানুষের কোন আচরণই অন্ধ নয়। প্রত্যেক আচরণই উদ্দেশ্যমূলক (purposive)। অর্থাৎ যখনই আমাদের মধ্যে কোন আচরণ-প্রতিক্রিয়া জেগে উঠে, তখনই তাকে তার নির্দিষ্ট পরিণতিতে পৌছে দেবার এক প্রেরণা আমরা অনুভব করি। এবং এই পরিণতি বা লক্ষ্যটি লাভ করাই আমাদের আচরণের উদ্দেশ্য বলে তাকে বলা হয় উদ্দেশ্যমূলক। কিন্তু, মনে রাখতে হবে যে, এই লক্ষ্যটি আমাদের কাছে সব সময়ে সমান স্পষ্ট নয়। স্পষ্টতার ক্রম আছে। একদিকে রয়েছে পূর্বনির্বাচিত, কল্পিত, স্পষ্ট লক্ষ্য এবং তাকে লাভ করার উপযুক্ত নির্দিষ্ট আচরণ। আর এক দিকে রয়েছে এমন কতকগুলি আচরণ যার উদ্দেশ্য মোটেই স্পষ্ট নয়। তবু উদ্দেশ্য সেখানে আছে। (৭) উদ্দেশ্যমূলক আচরণের আর একটি বৈশিষ্ট্য আছে। 'প্রতিক্ষেপ ক্রিয়া' (reflex action) দ্বারা আচরণের যে ব্যাখ্যা প্রচেষ্টা সেখানে বলা হয়েছে যে, প্রতিটি আচরণ হচ্ছে শরীরের বিশেষ কোন

একটি অঙ্গের বিশেষ কোন একটি মাংস পেশী থেকে উদ্ভূত প্রতিক্রিয়া মাত্র। কিন্তু উদ্দেশ্যমূলক আচরণ হচ্ছে সমগ্র শারীরি থেকে উদ্ভূত একটি সম্পূর্ণ আচরণ (total reaction of the organism).

মোটের উপর, ম্যাক্‌ডুগাল বলতে চান যে, উদ্দেশ্যমূলক আচরণই হচ্ছে মানুষের জীবনের একটি প্রাথমিক সত্য। মানুষের প্রকৃতি ও আচরণ সম্বন্ধে যদি সম্যক জ্ঞান লাভ করতে হয়, এবং তাকে প্রয়োজনানুযায়ী নিয়ন্ত্রণ করাই যদি হয় আমাদের উদ্দেশ্য, তাহলে যে কোন মনোবিজ্ঞানের আলোচনায় এই প্রাথমিক সত্যটিকে স্বীকার করে নিতেই হবে। যারা এই জাতীয় উদ্দেশ্যবাদ স্বীকার করতে রাজী নয়, তাদের উদ্দেশ্যে ম্যাক্‌ডুগাল আধুনিক পদার্থবিদ্যা ও প্রাণবিদ্যার উল্লেখ করলেন। গত যুগের বিজ্ঞানীরা প্রাকৃতিক ও যান্ত্রিক কার্যকারণের বাইরে আর কিছুই স্বীকার করতেন না। কিন্তু বর্তমানে তাঁদের সেই দৃঢ় মনোভাব শিথিল হয়ে গেছে। তাঁদের আধুনিক গবেষণাদি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, তারাও যেন পুরাতন যান্ত্রিক কার্যকারণের বাইরে অনেকটা ঝুঁকে পড়েছেন। কাজেই মানবজীবনে উদ্দেশ্যমূলক চেতসিক কার্যকারণের (Psychical causation) বিরুদ্ধে পুরাতন সংস্কারের পক্ষে সমর্থনযোগ্য কোন যুক্তিই আর নেই। সুতরাং প্রত্যেক মনোবিজ্ঞানীর উচিত এই উদ্দেশ্যমূলক চেতসিক কার্যকারণের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া।

ম্যাক্‌ডুগালের মতে আমাদের আচরণের কি বৈশিষ্ট্য, এবং কেন তাকে যন্ত্রের পর্যায়ে এনে আচরণবাদ বা যান্ত্রিক মনোবিজ্ঞানের দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না, তা' আমরা দেখলাম। এখন প্রশ্ন হচ্ছে : এই যে উদ্দেশ্যমূলক আচরণ, এ আসে কোথা থেকে ? কোথায় এর মূল উৎস ? এর উত্তরে ম্যাক্‌ডুগাল বললেন যে, মানুষের জীবনে সব কিছুর মূলে রয়েছে কতকগুলি প্রবণতা (instinct বা tendency)। এরা স্বভাবতঃই মৌলিক ও সহজাত (innate) ; এবং সমস্ত কর্ম আচরণের মূল উৎস হলো এরাই। এই সহজ ও অকৃত্রিম উৎস থেকে উৎসারিত হয়ে এরাই বিভিন্ন পারিপার্শ্বিকের মাঝ দিয়ে ক্রমে জটিলতর বুদ্ধি, চিন্তা ও অন্যান্য উন্নত বৃত্তি সমূহে রূপ নেয়।

আমাদের সমস্ত আচরণই যে উদ্দেশ্যমূলক—একথা মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে আরও কেহ কেহ বিশ্বাস করেন। পদার্থ বিদ্যা, ও প্রাণবিজ্ঞানের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে, মানসিক ক্রিয়ার কার্যকারণের সার্থকতায়ও তাঁরা বিশ্বাসী। এঁদের নাম সুখবাদী (hedonist)। এঁরা মনে করেন যে, মানুষের প্রত্যেক আচরণ কর্ম অনুষ্ঠিত হয় বিশেষ কোন অনাগত সুখ লাভ ও দুঃখ বর্জনের উদ্দেশ্যে। যে সমস্ত আচরণে দুঃখ ও কষ্ট, তাদের এড়িয়ে, যে সমস্ত আচরণ সুখ ও আনন্দ দেয় তাদেরই আমরা গ্রহণ করি। এই ভাবে দুঃখকে এড়িয়ে সুখ বা আনন্দকে কেন্দ্র করে আমাদের স্বভাব

বা ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠে। এ মতবাদ নিঃসন্দেহেই উদ্দেশ্যবাদী। কিন্তু ম্যাকডুগাল এ উদ্দেশ্যবাদকে গ্রহণযোগ্য মনে করেন না। প্রাণীজগত ও মানুষের জীবন থেকে নানা দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে এই জাতীয় উদ্দেশ্যবাদের অসারতা প্রমাণ করে তিনি নিজের বিশিষ্ট উদ্দেশ্যবাদের যুক্তি উপস্থিত করলেন, ও তার নাম দিলেন এষণাবাদ (hormic)।

এই এষণাবাদের মূল কথাটি একটি দৃষ্টান্ত নিয়ে অতি সহজে বোঝা যেতে পারে। যদি প্রশ্ন করা যায় যে, "কোন একটি মানুষ যখন 'অ', 'আ', 'ক', 'খ' ইত্যাদি অনেকগুলি লক্ষ্যের মাঝ থেকে 'অ' 'আ' ও 'ক'-কে বাদ দিয়ে 'খ'-কে বেছে নেয়, তার কারণ কি?"—তাহলে এর সাধারণ উত্তর হবে : "ঐ ওর স্বভাব।" ম্যাক্‌ডুগাল বলেন যে, এই সাধারণ উত্তরটি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা, সত্য সত্যই ঐ বিশেষ লক্ষ্যটির প্রতি আকর্ষণ ঐ লোকটির সহজাত ধর্ম। মানুষের জন্মগত প্রবণতা হলো কতকগুলি নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলা। তাদের লাভ করার জন্য যে-প্রেরণা বা এষণা, তাকে অবলম্বন করেই মানুষের সমগ্র জীবন নিয়ন্ত্রিত। এবং মানুষের সমস্ত কর্ম আচরণের মূল উৎস তারাই। মানুষকে জানতে হলে তাই তার এই মূল উৎস-গুলিকেই প্রথমে জানতে হবে। ম্যাক্‌ডুগাল এদের দু' শ্রেণীতে ভাগ করেছেন—বিশেষ ও সাধারণ। বিশেষ শ্রেণী-ভুক্তেরা মুখ্য, এবং তাদের তিনটি গুণ বা ধর্ম আছে—জ্ঞান

(Cognition) সংবেদন (affection), ও প্রচেষ্টা (Conation)। অর্থাৎ প্রত্যেক প্রবণতা মূলক কর্মের মধ্যে থাকে কোন বস্তু বা পদার্থের জ্ঞান; সেই বস্তু বা পদার্থের জ্ঞান থেকে উদ্ভূত একপ্রকার সংবেদনা; এবং সেই দিকে, অথবা তার থেকে অন্য দিকে শারীরিক প্রচেষ্টা। এর থেকে বোঝা যাবে যে ম্যাক্‌ডুগালের 'প্রবণতা' (instinct) শুধুমাত্র অন্ধ প্রবৃত্তি নয়। অন্ধ প্রবৃত্তির মধ্যে প্রবণতার এই বৈশিষ্ট্যগুলি নেই। এ বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা করতে হলে, এই কথাটা জানা যেমন দরকার, তেমনি জানা দরকার যে প্রতিক্ষেপ ক্রিয়ার সঙ্গে-ও এর যথেষ্ট পার্থক্য আছে। ইন্দ্রিয়ের উপর উদ্দীপনের প্রভাব পড়লে স্নায়বিক যে উত্তেজনা ও প্রতিক্রিয়া দেখা যায়, তারই নাম প্রতিক্ষেপ ক্রিয়া। এ প্রতিক্রিয়া নিতান্তই যান্ত্রিক ও স্নায়বিক পদ্ধতির অন্তর্গত। কিন্তু প্রবণতা মূলক ক্রিয়া প্রধানতঃই মানসিক। এই জন্যই এর নাম এষণা (horme, urge)।

যদিও বলা হয়েছে যে, এষণাই সমস্ত কর্ম ও আচরণের মূল উৎস—অর্থাৎ প্রত্যেক অচরণই বিশেষ এক প্রেরণার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে এক নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলেছে—তবু, মানব জীবনে সেই এষণাই দেখা দেয় বহুলাংশে পরিশোধিত ও পরিমার্জিত হয়ে। এষণার আদিম, বিশুদ্ধ সহজ ও প্রত্যক্ষ প্রকাশ দেখা যায় মানবেতর প্রাণী জগতে। মানুষের জগতে এসে বৃহত্তর মানসিক পরিবেশ, বিচিত্রতর

অভিজ্ঞতা, ও কর্মক্ষেত্রের জটিলতায় তারাই হয়ে ওঠে জটিলতর। কী ভাবে বিশুদ্ধ ও সহজ এষণা পরিশোধিত ও জটিল হয়ে ওঠে, সে সম্বন্ধে ম্যাক্‌ডুগাল চারিটি অবস্থার উল্লেখ করেছেন। (১) পূর্বপ্রত্যক্ষ বস্তুর 'ভাব' অথবা তারই সঙ্গে ভাবসাহচর্যে যুক্ত এমন কোন অন্য ভাব থেকে। (২) যে সমস্ত দৈহিক সঞ্চালনার ভিতর দিয়ে এষণা অভিব্যক্ত হয়, তাদের ক্রমান্বয়ে জটিল হওয়া সম্ভব। (৩) মানুষের 'ভাব' ও চিন্তাধারার জটিলতার জন্য অনেক সময়ে এমন হয় যে, একই সময়ে একাধিক কয়েকটি এষণা উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। ফলে তারা সকলে মিলিত হয়ে বিশেষ এমন একটি রূপ নেয় যে, তাদের মাঝ থেকে ওদের চিনে নেওয়া হঠাৎ শক্ত হয়ে পড়ে। (৪) কোন একটি বিশেষ ভাব বা বস্তুকে কেন্দ্র করে এষণারা সুশৃংখলার সঙ্গে সংহত হয়। এদের সকলকে আলাদা ভাবে না নিয়ে সাধারণ ভাবে কয়েকটি দৃষ্টান্ত সাহায্যে বিষয়টিকে পরিষ্কার করা যেতে পারে। মনে করা যাক, 'ভীতি'। ভীতি সর্বপ্রাণীর এক অকৃত্রিম এষণা। নানা কারণে, যেমন আকস্মিক কোন শব্দে, এই এষণাটি উদ্দীপ্ত হয়ে উঠ্‌তে পারে। অর্থাৎ কোন শব্দ তরঙ্গ এসে কানে ধাক্কা দিলে অন্তর্মুখীন স্নায়ু প্রবাহ দ্বারা নীত হয়ে সেই তরঙ্গ এষণাকে উত্তেজিত করে। যে কোন শব্দ হলেই এই ব্যাপারটি ঘটতে পারে। কিন্তু যেখা যায় যে, অন্তর্মুখীন স্নায়ু প্রবাহ সকল শব্দে সাড়া দেয় না। এবং

ফলে বিশেষ এষণাটিও সব সময়ে সক্রিয় হতে পারে না। এর কারণ এই যে, নানা প্রকার অভিজ্ঞতার মাঝ দিয়ে আসতে আসতে সেই স্নায়ু প্রবাহ নানা জাতীয় শব্দের মধ্যেকার পার্থক্যটুকু চিনতে শেখে। যে সমস্ত শব্দ অনেকবার শুনেছে অথচ কোন বিপদ বা ভয়ের কারণ ঘটেনি,—কিছুদিন পরে সেই সব শব্দে সে আর মন দেয় না। অর্থাৎ ভীতির এষণাটি এখানে জাগ্রত হয় না।

আর একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক্। মানুষবর্জিত কোন একটি দ্বীপে মানুষ যখন প্রথম যায়, তখন তাকে দেখে সেখানকার পশুপাখীরা ভয় পায় না। কারণ ভীতি-এষণার সঙ্গে যুক্ত যে অন্তর্মুখীন স্নায়ু-প্রবাহ, সে এক্ষেত্রে এখনও মানুষের ভীতি-জনক দিকের সঙ্গে পরিচিত হয়নি। কিন্তু কিছুদিন পরে যখন মানুষ তাদের শিকার করতে আরম্ভ করে, তখনই সে ভয় পেতে থাকে। কোন লোক আসছে, অথবা কাছাকাছি কোন লোকের অস্তিত্ব বুঝতে পারলেই সে শঙ্কিত হয়ে পড়ে ও পালাবার চেষ্টা করে। এই প্রকার ভীতিমূলক আচরণের মূল হলো কালিক সান্নিধ্যের ভিত্তিতে গঠিত সাহচর্য নীতি। উন্নত স্তরের প্রাণীদের মধ্যে এই নীতির যথেষ্ট প্রাচুর্য দেখা যায়। এবং বিশুদ্ধ এষণা অপেক্ষা এই নীতি দ্বারাই তারা তাদের আচরণ ব্যবহারকে বৃহত্তর ও জটিলতর পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে। যদিও এখানে শুধুমাত্র ভীতি এষণার কথা বলা হোল, তবু একথা মনে রাখতে হবে

যে, প্রত্যেক মুখ্য এষণাই এই ভাবে সংশোধিত হয়ে থাকে। এই মুখ্য এষণাগুলিকে ম্যাক্‌ডুগাল তেরোটি নির্দিষ্ট সংখ্যায় ভাগ করেছেন। তারা যথাক্রমেঃ বিপদ থেকে পলায়ন বা ভীতি (instinct of escape) ; বিতৃষ্ণা ও বিরক্তি (instinct of repulsion) ; কৌতূহল (instinct of curiosity) ; বিদ্বেষ (instinct of combat) , বাৎসল্য (Parental instinct) ; খাদ্যান্বেষণ (Food seeking instinct) ; সঙ্গ-প্রবণতা (gregarious instinct) আত্ম-প্রতিষ্ঠা (instinct of self-assertion) ; আত্ম-সমর্পণ (instinct of submission) ; যৌন মিলন (Mating instinct) ; সংগ্রহ ও সঞ্চয় (Acpui-sitive instinct) ; সংগঠন (Constructive instinct) ; আর্ত আবেদন (instinct of appeal)। এই তেরোটি এষণাই হচ্ছে মানব প্রকৃতির উপাদান। এ বাদে আরও কতকগুলি এষণার উল্লেখ ম্যাকডুগাল করেছেন ; তাদের মধ্যে হাসি একটি। কিন্তু তারা এদের মতো এতো প্রধান নয়। এই এষণাগুলিই হচ্ছে মানব জীবনের মূল ভিত্তি। আমাদের ব্যক্তিগত জীবন, সামাজিক জীবন সমস্তই দাঁড়িয়ে আছে এদেরই ঘাত, প্রতিঘাত, দ্বন্দ্ব সম্মিলনের উপর।

একটু আগেই আমরা উল্লেখ করেছি যে, কোন এষণাই মানব জীবনে সম্পূর্ণ ও অবিকৃত থাকে না। নানা প্রকার পারিপার্শ্বিকের মাঝ নিয়ে আসতে আসতে প্রত্যেকটি এষণা দেখা দেয় নতুন রূপে। 'অনুরাগ' (sentiment) হচ্ছে

এষণার এই জাতীয় এক উন্নত রূপ। যদিও আমাদের সমস্ত কর্ম আচরণের মূলে র'য়েছে বিশুদ্ধ ও অবিকৃত এষণা। তবু একদিক থেকে দেখতে গেলে, মানুষের জীবনে সমস্ত কিছুর মূলে প্রধানতঃ হলো 'অনুরাগ'। কোন বিশেষ বস্তু বা ভাব বা আদর্শের প্রতি মনের যে এক বিশেষ স্থায়ী ভঙ্গিমা (enduring conative attitude) তারই নাম অনুরাগ। প্রত্যেক অনুরাগের সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকে এক একটি আবেগ (emotion)। এবং এই আবেগ থেকে আসে আমাদের কর্ম ও আচরণ। এই আবেগের দিক থেকে অনুরাগ-কে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—প্রেম (love); ঘৃণা (hatred); ও মর্যাদা বোধ (self-regard)। যে সব দৃষ্টান্ত দিয়ে ম্যাকডুগাল এই জিনিষগুলিকে বিশ্লেষণ করেছেন তাদের মধ্য থেকে প্রেমের একটি দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক্। মনে করা যাক নিঃসঙ্গ, একাগ্র অধ্যয়ননিরত একটি ছাত্র। একদিন বাইরে থেকে বাড়ি ফিরে সে দেখতে পেলো তার দরজার সামনে আহত একটি কুকুর। গুরুতর আহত হয়ে কুকুরটির চলার শক্তি নেই। এ দেখে ছাত্রটির অত্যন্ত দয়া হলো। কুকুরটিকে তুলে ঘরে নিয়ে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা সে করলো। আস্তে আস্তে কুকুরটি ভালো হয়ে উঠলো। এই কদিনে কুকুরটির প্রতি ছাত্রটির এক মায়া জন্মেছে; এবং কুকুরটিও ছাত্রটির প্রতি তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে আরম্ভ করেছে। আস্তে আস্তে চমৎকার একটা সম্বন্ধ তাদের মধ্যে

গড়ে উঠেছে। তারপর হঠাৎ একদিক গাড়ী চাপা পড়ে কুকুরটি মারা গেল। ছাত্রটি অত্যন্ত বেদনা বোধ করলো এতে। এবং রাস্তায় ফেলে দেবার পরিবর্তে কুকুরটিকে অত্যন্ত আদর ও যত্নের সঙ্গে নিয়ে এসে সমাধিস্থ করলো। এবং সম্ভবতঃ একখানি ফটো-ও তার রেখে দিলে নিজের ঘরে। এই হচ্ছে প্রেম। এই দৃষ্টান্তের সাহায্যে ম্যাকডুগাল ভালোবাসার যে রূপ দেখিয়েছেন, শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' গল্পটির মধ্যে সে জিনিষটি অতি সুন্দর রূপে অভিব্যক্ত হয়েছে। ম্যাকডুগালের এই দৃষ্টান্তটি বিশ্লেষণ করলে অনুরাগের প্রকৃতি বোঝা যাবে। কুকুরটির প্রতি ছাত্রটির মধ্যে প্রথম দেখা গেলো দয়া ও বাৎসল্য ভাব (paternal instinct) ; তারপর এলো আত্ম প্রতিষ্ঠা (instinct of self-assertion)। কুকুরটিকে সে শাসন করে। সেই তার প্রভু ; তারপর ছাত্রটির নিঃসঙ্গ একক জীবনে কুকুরটি হয়ে উঠলো তার সাথী। এইখানে এলো সঙ্গ-প্রবণতা (gregarious instinct)। এইভাবে কতকগুলি মূল এষণার সংযোগে গড়ে উঠলো প্রেম, অনুরাগ। অন্যান্য যে কোন অনুরাগও গড়ে ওঠে এইভাবে।

আবার যে সমস্ত বস্তু বা ভাব বা আদর্শকে কেন্দ্র করে অনুরাগ গড়ে ওঠে সেদিক থেকেও তাকে তিন রকম ভাবে বিচার করা যেতে পারে—বিশেষ নির্দিষ্ট কোন বস্তুগত, যেমন সন্তানের প্রতি পিতা মাতার অনুরাগ ; সাধারণ বস্তুগত, যেমন শিশু জাতির প্রতি সাধারণ অনুরাগ ; এবং ভাবগত, যেমন

সততা, ন্যায়, পবিত্রতা ইত্যাদির প্রতি অনুরাগ। মানব জীবনে এদের আবির্ভাব কখনই আকস্মিক বা হঠাৎ নয়। এরা দেখা দেয় নির্দিষ্ট পর্যায়ক্রমে পরপর। বিশুদ্ধ এষণা থেকে অনুরাগ পর্যন্ত যেমন একটি স্পষ্ট ক্রমবিকাশ দেখা যায়, নিম্ন প্রাণী থেকে মানুষ পর্যন্ত, তেমনি ক্রমবিকাশ আছে মানুষেরই মধ্যে অনুরাগের ক্ষেত্রে। প্রথমে নির্দিষ্ট কোন বিশেষ বস্তুগত, পরে সাধারণ বস্তুগত, এবং শেষে ভাবগত—মানব জীবনে অনুরাগ আসে এই ভাবে। কোন একটি বস্তু-উদ্দীপনা এসে ভাবাবেগকে উদ্দীপ্ত করে। এই উদ্দীপনা যদি কিছুকাল পর্যন্ত ক্রমাগত আসতে থাকে, তাহলে সেখানে দেখা দেবে অনুরাগ। এক নিষ্ঠুর পিতা হয়তো তার ছেলেকে অত্যন্ত কড়া শাসনে রাখেন। প্রায়ই মারধর করেন। প্রথম প্রথম ছেলেটি ভয় পায় মার খাবার সময়। কিন্তু কিছুদিন বাদে এমন হয় যে, পিতাকে দেখলেই, এমনি ওর কথা মনে পড়লেই রীতিমতো ভীত হয়ে ওঠে সে। এই সময়ে তার মনের অবস্থা এমন হয় যে, তার পিতা অথবা পিতার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত এমন যে কোন বস্তু বা চিন্তার প্রতি সে সর্বদাই ভীত-প্রবণ হয়ে থাকে। বাৎসল্য ভাবটিও বেশ জটিল। সেখানেও ঐ একই জিনিষ দেখা যাবে। ছোটো শিশু তার স্বাভাবিক অসহায়তা ও অক্ষমতায় মায়ের মনে কোমল ভাবের উদ্রেক করে। এবং মা তাঁর সন্তানের অব্যক্ত মনোভাবের প্রতি সাড়া দেন। শিশুটি মায়ের এই সহানুভূতি বোঝে, ও এতে

উৎসাহিত এবং আনন্দিত হয়। পরস্পরের প্রতি এই সহানু-ভূতি ও আনন্দ হলো একেবারে গোড়ার কথা। তারপর ক্রমে ক্রমে এমন সময় আসে, যখন এর সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়ে পিতামাতার পরার্থপরতা (altruism) ও আত্মবোধ (egoism)। সন্তানের সুনাম-প্রশংসা, ও দুর্নাম-নিন্দাতে পিতামাতা নিজেরই সুনাম প্রশংসা ও দুর্নাম নিন্দা বোধ করেন। এই ভাবে স্নেহ করুণা ও সহানুভূতির সঙ্গে পরার্থ-পরতা ও আত্মবোধ জড়িত হয়ে বাৎসল্য ভাবকে এক জটিলতর রূপ দান করে। অর্থাৎ এই অনুরাগের পরিণত অবস্থায় মিলিত থাকে অনেকগুলি ভাব বা আবেগ। স্বদেশ প্রেম আর একটি অনুরাগ। এখানে কতকগুলি এষণা মিলিত হয় নিজের দেশকে অবলম্বন করে। দেশের বিপদে আমরা ভয় পাই। বিজাতীয় কর্তৃক সে আক্রান্ত হলে আক্রমণকারীর প্রতি আমরা ক্রুদ্ধ হই। অন্য কোন দেশের সঙ্গে যখন কোন বিষয়ে প্রতিযোগিতা হয় তখন অন্য সব দেশকে অতিক্রম করে আমার দেশ প্রতিষ্ঠালাভ করুক এই জাতীয় এক প্রেরণা প্রবল হয়ে ওঠে। যখন মনে হয় এই দেশ আমার মাতৃভূমি, জননী, তখন দেখা দেয় স্নিগ্ধ প্রেম। অর্থাৎ ভীতি, বিদ্বেষ, আত্মপ্রতিষ্ঠা ও প্রেম—এতো-গুলি অনুরাগের সংমিশ্রণে গড়ে ওঠে স্বদেশপ্রেম (Patriotism)। এই ভাবে অতি শিশুকাল থেকে নানা বিষয়, যেমন পিতা-মাতা, স্কুল, দেশ, ধর্ম ইত্যাদির প্রতি আমাদের অনুরাগ

জন্মাতে থাকে। প্রাণীজগতের নিম্নতম অবস্থা থেকে মানব-জীবন পর্যন্ত এষণার এই ক্রমবিকাশের মধ্যে ম্যাকডুগাল কয়েকটি স্তরের উল্লেখ করেছেন। (১) প্রাণীজগতের প্রথম হলো এ্যামিবা। এষণার বিকাশও তাই এই খানেই হয় সব চেয়ে আগে। কিন্তু তার সুস্পষ্ট, সুবিভক্ত, সুনির্দিষ্ট কোন রূপ এখানে নেই। শুধু মাত্র শিকার অন্বেষণের মধ্যেই তার এখানে প্রকাশ। এষণা এখানে একমুখী। (২) দ্বিতীয় স্তরে প্রাণীদের মধ্যে যে এষণা দেখা যায় তা অপেক্ষাকৃত নির্দিষ্ট একটি লক্ষ্য অবলম্বন করে বহুবিভক্ত হয়ে পড়েছে। (৩) আদি মানবের এষণা। এখানে এষণার রূপ অধিকতর নির্দিষ্ট ও স্পষ্ট। এইখান থেকে আরম্ভ হলো মানব জীবন। (৪) মানুষের জীবনে প্রথম স্তরের আচরণ। এখানকার আচরণ স্পষ্ট এষণামূলক ও লক্ষ্য-অভিমুখীন। যে-আচরণ ও যে-উপায়ে ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারা যায়, তা' এখানে নিয়ন্ত্রিত হয় পুরস্কার-শাস্তি (reward and punishment) নীতি দ্বারা। এই নীতি এই স্তরে শুধু মাত্র ব্যক্তিগত, অথবা ক্ষুদ্র পারিবারিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। কোন সামাজিক রূপ তার এখানে নেই। (৫) মধ্য স্তরের আচরণ। প্রথম স্তরের মতো এ-ও এষণামূলক ও লক্ষ্য-অভিমুখীন। কিন্তু এখানে সে নিয়ন্ত্রিত হয় সামাজিক প্রতিক্রিয়ার ভিত্তিতে। অর্থাৎ যে পথ সমাজ কর্তৃক সমর্থিত হবার সম্ভাবনা নেই, সে পথ বাদ দিয়ে সে অবলম্বন করে সমাজ সমর্থিত কোন

পথ। (৬) উচ্চ স্তরের আচরণ। এই স্তরে দেখা দেয় নীতি-বোধ (morality)। সমগ্র মানব সমাজের আদর্শস্বরূপ যে নীতি তারই আলোকে নিয়ন্ত্রিত হয় এখানকার এষণা।

এ পর্যন্ত যা বলা হলো তা থেকে বোঝা যাবে যে, (১) মানব-প্রকৃতি ও আচরণ সব সময়েই এষণামূলক ও লক্ষ্য অভিমুখীন। (২) আমাদের মনের ভিত্তি হলো কতকগুলি সহজাত প্রেরণা ; এবং সেই প্রেরণাই চালনা করে আমাদের লক্ষ্য অভিমুখে। (৩) আমাদের সমস্ত কর্ম আচরণের উৎস হলো এই প্রেরণাগুলি। এই হলো ম্যাক্‌ডুগালের মনোবিজ্ঞানের সুস্থ বা সাধারণ মনের বিজ্ঞান। অসুস্থ মনের (abnormal psychology) বিজ্ঞান সম্মত গবেষণা ও পরীক্ষা করেও ম্যাকডুগাল তার এই মতবাদের সমর্থন সেখানে পেয়েছেন। মানব মন ও আচরণের যে সকল অসুস্থ ও অস্বাভাবিক বিকৃতি দেখা যায়, তার মূল কারণ হলো মানব মনের আদি প্রেরণা। যতোক্ষণ পর্যন্ত সে তার স্বাভাবিক বিকাশ ও পরিণতিতে বাধা না পায় ততোক্ষণ পর্যন্ত আমরা সুস্থ ও সুখী থাকি। কিন্তু যখনই তার সেই স্বাভাবিক অগ্রগতিতে বাধা পড়ে, বা তাকে অত্যন্ত কঠিন প্রতিকূল অবস্থার মাঝ দিয়ে অগ্রসর হতে হয়, তখনই সে বিকৃত হয়ে পড়ে, এবং ফলে দেখা দেয় নানা প্রকার আধিব্যাধির লক্ষণ। এই যদি হয় মানসিক ব্যাধি ও রোগের কারণ, তাহলে তাদের সম্বন্ধে সাবধান হওয়া আমাদের পক্ষে এমন কিছু অসম্ভব

হবে না। মূল এষণাগুলি সম্বন্ধে জ্ঞান, তাদের উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণ, ও পরিচালনা দ্বারা জীবনের সমস্ত বিকৃতি ও অস্বাভাবিক পরিণতিকে এড়িয়ে সুস্থ ও সুন্দর জীবন লাভ করা, তাই, ম্যাকডুগালের মতে খুবই সম্ভব।

ম্যাকডুগালের এই মতবাদের আর একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ক্রমবিকাশবাদের (theory of evolution) সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। আমরা আগেই দেখেছি যে এই মতবাদে, মনের গঠন ও ক্রিয়া পদ্ধতির ক্রমবিকাশের বেশ একটি সহজ ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। ম্যাকডুগাল মনে করেন যে, অন্যান্য মনো-বিজ্ঞানে এই জিনিষটি নেই, এবং তাঁর মনোবিজ্ঞানের অন্যতম সার্থকতা এইখানে। প্রাকৃতিক ও মানসিক কোনো রকম কার্যের জন্য ম্যাকডুগাল যান্ত্রিক পদ্ধতিকে যোগ্য মনে করেন না। আমাদের অভিজ্ঞতা ও কতকগুলি বিচ্ছিন্ন অংশের সংযোগে গঠিত একথাও তিনি অস্বীকার করেন। প্রত্যেক অভিজ্ঞতা একটি ঐকিক সমগ্র (unitary whole); এই তার সিদ্ধান্ত। এই ঐকিক সমগ্রের মধ্যে অবশ্য বিভিন্ন অংশকে পৃথকভাবে প্রত্যক্ষ করা যেতে পারে। কিন্তু তাদের সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ একেবারেই অসম্ভব। ক্ষুদ্র এ্যামিবা থেকে মানুষ পর্যন্ত একই ধারায় চলে আসছে জৈবিক ও মানসিক ক্রমবিকাশ। ম্যাকডুগাল দাবী করেন যে, একমাত্র তাঁরই মনোবিজ্ঞান দ্বারা এই জৈবিক ও মানসিক রূপান্তরের যুক্তি-সঙ্গত ব্যাখ্যা

দেওয়া সম্ভব। নির্দিষ্ট কতকগুলি এষণা ও তাদের উপরই যদি হয় মানব জীবনের ভিত্তি তাহলে আমাদের দর্শন শাস্ত্রকেও বিচার করতে হবে সেই অনুসারে। বিশুদ্ধ ও শুষ্ক মননশীলতাকে কিছুটা কমিয়ে এনে দেখতে হবে যে, আমাদের দর্শন বিচারে জীবনের এই মূল সত্যটি স্বীকৃত হয়েছে কি না। অর্থাৎ ম্যাকডুগাল মনে করেন যে, দর্শন-শাস্ত্রকে যদি সার্থক করতে হয় তবে তাকে গ্রহণ করতে হবে এই এষণাবাদী মনোবিজ্ঞানের ভিত্তিতে। বুদ্ধিধর্মী বা intellectual দর্শন, অথবা যান্ত্রিক মনোবিজ্ঞান,—কেউই মানব জীবনের আশা আদর্শ সৌন্দর্যবোধ ইত্যাদির কোন সঙ্গত ব্যাখ্যা দিতে পারে না। তার কারণ তাদের বিচারের গোড়াতেই রয়ে গেছে গলদ। সমস্ত প্রচেষ্টার মূল উৎস যে এষণা তা তারা দেখতে পাননি। ম্যাকডুগাল মনে করেন তাঁর মনোবিজ্ঞান এই গুরুতর ত্রুটিগুলি দূর করবে। তাঁর দৃষ্টি শুধুমাত্র মানসিক তথ্য—যেমন সংবেদন, প্রত্যয় ইত্যাদির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তাই তার মনোবিজ্ঞান বিশুদ্ধ যান্ত্রিক মনোবিজ্ঞানের সীমা অতিক্রম করে ছড়িয়ে পড়েছে সমাজ-বিজ্ঞান, অর্থনীতি, দর্শন পর্যন্ত। এবং সমগ্র মানব জীবনের মূল ভিত্তি পর্যন্ত পৌঁছে তার সম্বন্ধে আমাদের সচেতন করে তুলেছে। তাই তার মনোবিজ্ঞান-কে বলা যায় জীবন-ধর্মী মনোবিজ্ঞান। ম্যাকডুগালের মনোবিজ্ঞানের গুরুত্ব ও নতুনত্ব হলো এইখানে।

আচরণবাদ

আচরণবাদ নামে আধুনিক মনোবিজ্ঞানে যে শাখাটির কথা আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি তার প্রধান প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছেন আমেরিকার জন ওয়াটসন (J. B. Watson)। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে এবং বিংশ শতাব্দীর একেবারে গোড়ার দিকে যে মনোবিজ্ঞানকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিলো তার প্রধান ও একমাত্র উদ্দেশ্য ছিলো চেতনা বা মনের বিশ্লেষণ ও বৈশিষ্ট্য নির্ণয়ন ; এবং তার পদ্ধতি ছিলো অন্তর্নিরীক্ষণ (introspection)। এই মনোবিজ্ঞানের নেতা ছিলেন ভূণ্ট (Wundt), টিচেনার (E. B. Tichener), ও জেম্‌স্‌ (William James)। ওয়াটসনের আচরণবাদ দেখা দিলো এদেরই বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মাঝ দিয়ে। ওয়াটসন বললেন যে টিচেনার জেমস্‌ প্রবর্তিত যে মনোবিজ্ঞান তার দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক। কেননা, তাঁরা 'চেতনা' নামে এমন একটি জিনিষকে মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়বস্তু বলে গ্রহণ করেছেন যার নির্দিষ্ট কোন ব্যবহারযোগ্য রূপ নেই। এবং অন্তর্নিরীক্ষণ পদ্ধতিটি শুধুমাত্র ব্যক্তিগত একটি ব্যাপার। সম্পূর্ণ বস্তুগত বৈজ্ঞানিক মানদণ্ডে তাকে বিচার করা সম্ভব নয়। কাজেই ১৯১২ সালে তিনি লিখলেন : "আচরণবাদীরা এই

সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, ধরা ছোঁওয়ার বাইরের কোন বস্তু নিয়ে তাঁরা আর সন্তুষ্ট থাকতে পারেন না। কাজেই তাঁরা স্থির করেছেন যে, হয় তাঁরা মনোবিজ্ঞানের আলোচনা সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেবেন, আর না হয়তো তাকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের পর্যায়ে নিয়ে আসবেন।" এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ওয়াট্‌সন্ বললেন যে 'চেতনা', 'আত্মা', 'মন' ইত্যাদি বস্তুগুলির কোন বাস্তব ভিত্তি নেই ; তারা আমাদের ধরা ছোঁওয়ার বাইরে ; অতএব মনোবিজ্ঞানের আলোচনায় এদের আমরা নিরাপদে বর্জন করতে পারি। কেননা, বিজ্ঞান-সম্মত মনোবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য হচ্ছে শুধুমাত্র আচরণ নিয়ন্ত্রণ।

প্রচলিত মনোবিজ্ঞানের বিরুদ্ধে ওয়াটসনের এই যে মতবাদ একে ভালো করে বুঝতে হ'লে এর আবির্ভাবের সময়ের পরিবেশ সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা থাকা আবশ্যক। প্রথমতঃ, মনোবিজ্ঞানের যে শুধুমাত্র বিশুদ্ধ চেতনা বা মনের বিশ্লেষণ, এই কথাটা আমেরিকার মনোবিজ্ঞানীরা কোন দিনই সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করতে পারেন নি। প্রকৃতপক্ষে মনের গঠন ও বৈশিষ্ট্যকে স্বীকার করে নিয়েও তার ক্রিয়াপদ্ধতি, অর্থাৎ মানুষের আচরণের দিকেও বেশ খানিকটা ঝুঁকে পড়েছিলেন তাঁরা। মনোবিজ্ঞানকে প্রাণবিজ্ঞানের সঙ্গে এক শ্রেণীভুক্ত করা যায় কিনা এই ছিলো তাঁদের প্রচেষ্টা, এবং প্রকৃতপক্ষে এই দৃষ্টি নিয়ে সমগ্র মনোবিজ্ঞানের রূপটিই বদলে দেবার সূচনাও তাঁরা করেছিলেন। মনের প্রতিটি ক্রিয়া, বৈশিষ্ট্য তাঁরা বিচার

করতে চাইলেন সমগ্র জাতির ক্রমবিকাশের' কতকগুলি বিভিন্ন পর্যায় হিসাবে। ক্রমবিকাশের বিশেষ বিশেষ স্তরে বিশেষ বিশেষ কতকগুলি পরিস্থিতির মধ্যে প্রয়োজন হয়ে প'ড়েছিলো কতকগুলি বিশেষ ধরণের মনোবৃত্তি। ফলে দেখা দিলো সেই মনোবৃত্তি। অর্থাৎ, মনোবিজ্ঞানের আলোচনায়, মনের সঙ্গে তার পরিবেশের যে সম্বন্ধ ক্রম-বিকাশের মধ্য দিয়ে গ'ড়ে উঠেছে, তাকে বাদ দিলে চলবে না। একদিকে এই মতবাদ যেমন বেশ প্রবল হ'য়ে উঠছিলো, অন্যদিকে আবার, ঠিক একই সময়ে দৃষ্টি প'ড়ে-ছিলো মনের ক্রিয়া পদ্ধতি নিয়ে পরীক্ষাকার্যের দিকে। অর্থাৎ বলা হলো যে, পদ্ধতি হিসাবে শুধুমাত্র অন্তর্নিরীক্ষণ নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা আর সম্ভব হয়ে উঠছে না। এবং তা ঠিকও নয়। কেননা, মনোবিজ্ঞানকে যদি আনতে হয় খাঁটি বিজ্ঞানের পর্যায়ে, তা'হলে তার পদ্ধতিকেও হতে হবে নৈর্ব্যক্তিক। গল্‌টন্ (Francis Galton), এবিংহউস (H. Ebbinghaus), প্রভৃতি কর্মীরা এদিক থেকে উল্লেখযোগ্য পরীক্ষা আরম্ভ করে দিয়ে পথ দেখালেন। এই দুটি চিন্তাধারা যদি এক সঙ্গে লক্ষ্য করা যায়, তাহলে আমরা একটি জিনিষ স্পষ্ট দেখতে পাই। সে হচ্ছে এই যে, মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞা ও বিষয় বস্তু নির্ণয় করতে গিয়ে শুধুমাত্র চেতনার কথা আর উল্লেখ করা হচ্ছে না। অর্থাৎ বলা হচ্ছে যে, মন বা চেতনার কোন বিশুদ্ধ নির্বিকার রূপ আমাদের কাছে অবাস্তব। মানুষের বিভিন্ন কর্ম আচরণের

মধ্য দিয়েই মনের অভিব্যক্তি। কাজেই 'মন' বা 'চেতনা' মনোবিজ্ঞানের আসল বিষয়বস্তু হলেও কর্ম আচরণ ইত্যাদির সঙ্গে সে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞা তাই এঁরা দিলেন এইভাবে ঃ "মানুষের কর্ম আচরণের বিজ্ঞান-ই হচ্ছে মনোবিজ্ঞান।" এই যে নতুন এক চিন্তাধারা দেখা দিলো মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, ওয়াট্‌সন্‌ নিজের শিক্ষা পেয়েছিলেন এরই পরিবেশে। কিন্তু তবু তিনি এই মতের সঙ্গে সম্পূর্ণ সায় দিতে পারলেন না। তাঁর প্রধান বক্তব্য হলো এই যে, 'আচরণ' (behaviour) ও 'চেতনা' সম্পূর্ণ আলাদা বস্তু ; কোন প্রকার সম্বন্ধই এদের মধ্যে নেই। কাজেই মনোবিজ্ঞানকে যদি মানতেই হয় আচরণবিজ্ঞান ব'লে, তবে চেতনা বা মন বাদ দিয়েই তা সম্ভব। চেতনার কোন প্রকার উল্লেখ ও অন্তর্নিরীক্ষণ সেখানে অনাবশ্যক। মনোবিজ্ঞানের কাজ হচ্ছে শুধুমাত্র মানুষের আচরণ ব্যবহার ইত্যাদি নিয়ে। এদের আমরা দেখিতে পাই, বুঝি, পরীক্ষা করতে পারি, এবং মাপতে পারি। এবং এদের সম্বন্ধে কতকগুলি নীতিও আমরা বস্তুগতভাবে আবিষ্কার করতে পারি। আর, এই যদি হয় মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু, তাহলে তার পদ্ধতি হতে পারে বস্তুগত। এবং সেই বস্তুগত পদ্ধতি হচ্ছে 'উদ্দীপক প্রতিক্রিয়া পদ্ধতি' (method of stimulus-response action)। প্রত্যেক প্রাণীর উপর তার পারিপার্শ্বিক শত সহস্র রকমে প্রভাব বিস্তার করছে। যেমন, হঠাৎ যদি

আমার সামনে একটা তীব্র আলো জ্বলে ওঠে, তাহলে আমার চোখ বন্ধ হয়ে আসে। কিংবা হঠাৎ যদি আমার পিছন দিকে বন্দুকের আওয়াজ হয় তাহলে আমি চম্‌কে উঠ্‌বো, এবং সম্ভবতঃ পিছন দিকে ফিরে তাকাবো। এখানে আলো জ্বলে ওঠা, সমস্ত আলো এক সঙ্গে নিভে যাওয়া, ও বন্দুকের আওয়াজ —এরা হচ্ছে উদ্দীপক ; এবং সেই উদ্দীপকের সঙ্গে সঙ্গে আমার মধ্যে যে সাড়া জাগছে সঙ্কুচিত ও বিস্ফারিত চোখ, এবং চমকে ওঠার মাঝ দিয়ে, তাকেই বলা হয় প্রতিক্রিয়া। জন্মের প্রথম মুহূর্ত থেকে, এমন কি তারও কিছু আগে থেকে মানুষের উপর কোন না কোন উদ্দীপক ক্রিয়া করতে থাকে ; এবং এই ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া চলতে থাকে সমস্ত জীবন। এই ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াই হচ্ছে মানুষের আচরণ। নবজাত শিশুর জীবনে উদ্দীপকের সংখ্যা খুবই কম। তাই তার প্রতিক্রিয়াও নির্দিষ্ট সংখ্যক ও স্পষ্ট। কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেখা দেয় জটিলতা, এবং তাদের সংখ্যাও অনেক বেড়ে যায়। যেমন, মানুষের যে-প্রতিক্রিয়াকে আমরা বলি 'ভয়' কোন একটি শিশুর মধ্যে তাকে সম্পূর্ণ করে পাওয়া যাবে মাত্র দুটি উদ্দীপক থেকে—উচ্চ আওয়াজ, ও শক্ত করে ধরে রাখতে পারে এমন কোন অবলম্বনের অভাব। সাপ, অন্ধকার, কুকুর ইত্যাদি থেকে বয়স্কেরা ভয় পায় ; কিন্তু ছোট শিশু তা পাবে না। অর্থাৎ শ্বাস রোধ হয়ে যাওয়া, সমস্ত শরীর শক্ত হয়ে যাওয়া ও উদ্দীপক থেকে দূরে সরে যাওয়া

ইত্যাদি যে সমস্ত আচরণ ভয়ের বস্তুগত লক্ষণ, তার কোনটিই ছোট শিশুর মধ্যে নেই। এখন প্রশ্ন হচ্ছেঃ শিশুকালে যদি মাত্র দুটি উদ্দীপকই হয় ভয়ের কারণ তবে, পরে সেই একই ভয়ের কারণ অন্যান্য উদ্দীপক হয় কেমন করে? ওয়াট্‌সন্‌ এর উত্তর দিলেন তাঁর 'সাপেক্ষ প্রতিবর্ত' (Conditioned Reflex) নীতির দ্বারা। এই সাপেক্ষ প্রতিবর্ত নীতিই হচ্ছে মানুষের সমস্ত কর্ম আচরণের মূল। এবং এরই সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায় মানুষের সমস্ত কর্ম ও আচরণ। এই নীতিটি অবশ্য ওয়াট্‌সনের নিজের আবিষ্কার নয়। এটি তিনি পেয়েছিলেন বিখ্যাত রুশ শরীরবিজ্ঞানী (Physiologist) পাভ্‌লভের (I. P. Pavlov) কাছ থেকে। পাভ্‌লভের গবেষণার বিষয় ছিলো পরিপাক ক্রিয়ার শরীর বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে। এবং তিনি তাঁর পরীক্ষা আরম্ভ করেছিলেন একটি কুকুর নিয়ে। কুকুরটির সামনে কোন খাবার জিনিষ দিলে তার মুখে লালা দেখা দেবে এটা স্বাভাবিক; কিন্তু কিছুদিন বাদে দেখা গেলো যে যে-লোকটি তাকে নিয়মিত খাবার এনে দেয়, অথবা রোজই যে-পাত্রে, তাকে খাবার দেওয়া হয়, শুধুমাত্র সেই লোকটি অথবা সেই পাত্রটি দেখলেই কুকুরটির মুখে লালা গড়িয়ে আসতে থাকে। এমন কি, রোজ যখন কুকুরটিকে খাবার দেওয়া হচ্ছে, ঠিক সেই সময়ে, নিয়মিত কিছুদিন পর্যন্ত ঠিক একই আওয়াজের একটি ঘণ্টা বাজানো হতে থাকলো। তারপর

এমন দেখা গেলো যে খাবার না দিয়ে শুধুমাত্র ঘণ্টাটি বাজালেই কুকুরটির মুখে জল আসতে থাকে। খাবারের সঙ্গে লালার স্বাভাবিক যোগ আছে। কিন্তু খাবারের পরিবর্তে তার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত অন্য কোন কিছুর সঙ্গে লালা নিঃসৃত হওয়ার এই যে আনুষঙ্গ সম্বন্ধ, পাভ্‌লভ এর নাম দিলেন "সাপেক্ষ প্রতিবর্ত।"—এই বিশ্লেষণকে ওয়াটসন প্রয়োগ করলেন তাঁর মনোবিজ্ঞানে, এবং বললেন যে, শিশুকালের সহজ ও সরল শারীরিক প্রতিক্রিয়া থেকে আরম্ভ করে পরিণত বয়সের যাবতীয় জটিল প্রতিক্রিয়া, এমন কি আমাদের সমস্ত শিক্ষা, চিন্তা ইত্যাদির ভিত্তি হচ্ছে এই সাপেক্ষ প্রতিবর্ত নীতি। অর্থাৎ, তারা হচ্ছে এই সাপেক্ষ প্রতিবর্তেরই বিভিন্ন অভিব্যক্তি মাত্র।

মানুষের বিশেষ একটি শারীরিক গঠন-বৈশিষ্ট্য আছে। এবং সেই বৈশিষ্ট্যের জন্যই জন্মের মুহূর্ত থেকে তার মধ্যে দেখা যায় কতকগুলি নির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়া—যেমন নিঃশ্বাস প্রশ্বাস, হাঁচি, হৃদস্পন্দন, ইত্যাদি। এই মৌলিক প্রতিক্রিয়াগুলি প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই সাধারণ, আজকের দিনে এদের আমরা দেখতে পাচ্ছি ; কিন্তু সম্ভবতঃ পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাবের প্রথম মুহূর্তেও এরা বর্তমান ছিলো। এই চিরন্তন পুরানো প্রবৃত্তিগুলিকে ওয়াটসন নাম দিলেন সহজ বা প্রাথমিক আচরণ (unlearned behaviour)। সহজ প্রবৃত্তি (instinct) ব'লে মনোবিজ্ঞানীরা যে জিনিষটি মানুষের মধ্যে

স্বীকার করে নিয়েছিলেন, ওয়াট্‌সন্ তাকে অস্বীকার করলেন, এবং তার পরিবর্তে আনলেন সহজ আচরণ। তিনি বললেন যে, পিতামাতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে, বংশানুক্রমিতার নিয়ম অনুসারে কোন প্রেরণা, প্রবৃত্তি মনোভাব বা কোন মানসিক বৃত্তিই আমরা পাই না। কাজেই অন্যান্য মনোবিজ্ঞানীরা যাকে বলেন সহজাত প্রবৃত্তি, সে জিনিষটি প্রকৃত পক্ষে বংশগত ও সহজাত নয়; সে হচ্ছে কতকগুলি আয়ত্তকৃত বা অভ্যস্ত আচরণ (Learned behaviour)। মোটামুটি নির্দিষ্ট একটি শারীরিক গঠন ও তার সঙ্গে পারিপার্শ্বিকের প্রভাব—এই দুয়ের সহযোগিতায় গড়ে ওঠে পরিণত মানুষের আচরণ। বিভিন্ন ব্যক্তি বা জাতির মধ্যে বংশগত শারীরিক আকৃতি ও গঠনের পার্থক্য আছে—একথা ঠিক। যেমন কারু নাক সরু, অন্য কোন জাতির হয়তো চ্যাপটা মোটা; কোন জাতি হয়তো দীর্ঘকায় গৌরবর্ণ, অন্য এক জাতি খর্বকায় কৃষ্ণবর্ণ। এ পার্থক্যগুলি বংশগত। কিন্তু তার মানেই এ নয় যে, তাদের আচরণও বংশগত। বংশগত আকৃতি ও গঠন নিয়ে যখন আমরা পৃথিবীতে আসি তখন অসংখ্য উদ্দীপকের সম্মুখীন আমাদের হতে হয়। আমাদের আচরণ প্রধানতঃই নির্ভর করে সেই উদ্দীপক বা পারিপার্শ্বিকের উপর। অতি ছোট বয়স থেকে, বিভিন্ন ব্যক্তির পারিপার্শ্বিকের মধ্যে যতোটা সাদৃশ্য থাকবে, তাদের আচরণও সেই অনুসারে এক রকম হবে। অনেক সময়ে দেখা যায় যে, কোন একজন ওস্তাদ গায়কের

ছেলেও হয়ে উঠলো একজন ওস্তাদ গায়ক; কিংবা যে লোক চোর, তার ছেলেও সাধারণতঃ চোর। এর থেকে আমরা সাধারণতঃ মনে করি যে মানসিক বৃত্তি বংশানুক্রমিক। ওয়াট্‌সন্ বলেন যে, আমাদের এ ধারণা ভুল। গায়কের ছেলে গায়ক হয় তার কারণ, ছোটবেলা থেকেই তার পরিবেশ সঙ্গীতের আবহাওয়ায় পরিপূর্ণ। সেই আবহাওয়ার মধ্যে পালিত হওয়ার ফলে তার আচরণও নিয়ন্ত্রিত হয়ে যায় সেই অনুসারে। অর্থাৎ ওয়াট্‌সন্ বলতে চান যে, আচরণবাদে মানসিক বৃত্তির কোন স্থান নেই। কাজেই মানসিক বৃত্তি বংশানুক্রমিক কিনা, আচরণবাদে সে প্রশ্ন-ও অবান্তর। কেননা, মানসিক বৃত্তি ব'লে যাকে আমরা মনে করেছি, প্রকৃত পক্ষে সে হচ্ছে বিশেষ কোন একটি পারিপার্শ্বিক থেকে আগত বিশেষ কোন উদ্দীপকের শারীরিক প্রতিক্রিয়া। তা পূর্বদত্ত বা সহজাত নয়। তা হচ্ছে ব্যবহারিক ও স্থানীয়। একথা যদি ঠিক হয় তবে মানুষের মধ্যে বুদ্ধি কর্মক্ষমতা ইত্যাদির দিক থেকে জন্মগত কোন পার্থক্যই থাকতে পারে না। যে-কোন সুস্থ ছেলে মেয়ে উপযুক্ত পারিপার্শ্বিক (environment) ও শিক্ষার প্রভাবে যে-কোন কিছু হয়ে উঠতে পারে। প্রকৃত পক্ষে সে দাবীও ওয়াটসন করেন।

এ পর্যন্ত আমরা যা দেখলাম সে হচ্ছে আচরণবাদের মূল নীতি। এই মূল নীতিকে আচরণবাদীরা মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন, এবং জীবনের বিভিন্ন বিষয়ের

ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছেন এরই সাহায্যে। প্রথমতঃ মানুষের সমস্ত শারীরিক আচরণকে ওয়াট্‌সন্ তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন—আন্তরযন্ত্রীয় (visceral), কায়িক (manual) ও বাচনিক (laryngical)। পাকস্থলী, শ্বাসপ্রশ্বাস, রক্তচলাচল, যৌনযন্ত্র, প্লীহা, যকৃৎ, বিভিন্ন গ্রন্থিসমূহ, স্নায়ু ইত্যাদির ক্রিয়াকে বলা হয় আন্তরযন্ত্রীয় আচরণ ; দেহের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের—যেমন হাত পা কাঁধ মাথা ইত্যাদির যে আচরণ তাকে বলা হয় কায়িক আচরণ ; আর কণ্ঠনলী, জিভ্, দাঁত ও মুখবিবরের যে সম্মিলিত ধ্বনিগত আচরণ—তার নাম বাচনিক আচরণ। এই তিন শ্রেণীর আচরণকে ওয়াট্‌সন্ ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। প্রথমে নেওয়া যাক আন্তরযন্ত্রীয় আচরণ। একে আমরা সাধারণ প্রচলিত ভাষায় বলি প্রক্ষোভ বা আবেগ (emotion)। প্রক্ষোভ জিনিষটি শুধু মাত্র শরীর যন্ত্রের কতকগুলি পরিবর্তন ভিন্ন আর কিছুই নয়। বিশেষ কোন পরিস্থিতির মধ্যে, শরীরের অন্তর যন্ত্রের ও গ্রন্থির উদীপনা ও তার ফলে যে-শারীরিক প্রতিক্রিয়া তাকেই ওয়াট্‌সন্ বলেন প্রক্ষোভ। অর্থাৎ প্রক্ষোভ নামে যে-জিনিষটি মনোবিজ্ঞানে প্রচলিত আছে তার ভিত্তি হচ্ছে কতকগুলি আন্তরযন্ত্রীয় প্রতিক্রিয়া বা বিশেষ আচরণভঙ্গি। প্রত্যেক প্রক্ষোভের সঙ্গে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে কিছু কিছু কর্মপ্রবণতা দেখা যায় একথা ঠিক ; কিন্তু আন্তরযন্ত্রীয় ও গ্রন্থি সম্পর্কিত কার্যাবলী তার চেয়ে প্রধান। কাজেই প্রক্ষোভের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে

মন বা চেতনা বা কোন মানসিক বৃত্তি ও প্রবণতার সাহায্য নেবার কোন আবশ্যক নেই। আন্তরযন্ত্রীয় ও গ্রন্থি সম্পর্কিত কার্যাবলীর বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারাই তাকে বোঝা যেতে পারে। অবশ্য একথা যদিও সত্য যে আন্তরযন্ত্রীয় কার্যাবলীকে প্রত্যক্ষভাবে পরীক্ষা করার যথেষ্ট অসুবিধা আছে, তবু তার কতকগুলি বাইরের প্রকাশ দ্বারা তাকে আমরা জানতে পারি, যেমন ধমনীর স্পন্দন, রক্তের চাপ ইত্যাদি। কিন্তু বহুক্ষেত্রে এই প্রতিক্রিয়া আচরণ এতো বেশী জটিল ও বিস্তৃত যে তাদের নিয়ে পরীক্ষা করা প্রায় অসম্ভব। সেই জন্য ওয়াট্‌সন্ দৃষ্টি দিলেন ছোটো শিশুর দিকে। সেখানে দেখা গেলো তিনটি স্পষ্ট প্রক্ষোভ-আচরণ ভঙ্গি—যার নাম আমরা দিয়েছি ভয়, ক্রোধ, ও ভালোবাসা। ওয়াট্‌সন এদের ব্যাখ্যা করলেন পারিপার্শ্বিকের বিশেষ পরিস্থিতি ও তার থেকে উদ্দীপ্ত প্রতিক্রিয়া আচরণের সাহায্যে। নবজাত শিশুর মধ্যে এই তিনটি বাদে আর কোন প্রক্ষোভের সন্ধান না পেয়ে এই তিনটিকেই তিনি মানুষের মৌলিক ও প্রাথমিক আচরণ বলে স্বীকার করলেন। পরিণত বয়সের যে অন্যান্য প্রক্ষোভ বা প্রক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া-আচরণ তা এদেরই বিভিন্ন অভিব্যক্তি মাত্র। শিশু অবস্থায় মানুষের ভয়ের মূল ও প্রত্যক্ষ উদ্দীপক ছিলো কোন প্রকার তীব্র আওয়াজ, ও অবলম্বনের অভাব। রাগের উদ্দীপক ছিলো নিজের স্বাধীন খেয়াল খুসিতে বাধা, ও ভালোবাসার ছিলো শরীরে মৃদু আঘাত করা চাপড়ানো।

এইগুলি হচ্ছে সহজ ও প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া। কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পারিপার্শ্বিকের পরিবর্তন ও বিস্তৃতি হতে থাকে ; ফলে, প্রতিক্রিয়া আচরণও হয়ে পড়ে যথেষ্ট জটিল ও বিস্তৃত। আমাদের উদ্দীপকের সংখ্যাই যে শুধু বেড়ে যায় তাই নয়, আমাদের প্রতিক্রিয়া আচরণও যথেষ্ট পরিবর্তিত হয়ে যায়; ও অনেক নতুন প্রতিক্রিয়া এসে তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। সদ্যোজাত শিশু থেকে তিন বছর বয়সের শিশু নিয়ে পরীক্ষা করে ওয়াট্‌সন্ দেখেছেন যে, বিড়াল ইঁদুর কুকুর আগুন ইত্যাদির সঙ্গে প্রথম যখন পরিচয় হয় তখন শিশুর আচরণে ভয়ের কোন লক্ষণই থাকে না। এমনকি চিড়িয়াখানায় নিয়েও দেখা গেছে যে, সাপ বা অন্যান্য জন্তু জানোয়ার দেখেও শিশু ভয় পায় না। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, 'ভয়'-প্রক্ষোভটি বংশানুক্রমিক নয়। বিশেষ পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে আন্তরযন্ত্রের বিশেষ প্রতিক্রিয়াকেই আমরা বলি 'ভয়'। এবং সেই প্রতিক্রিয়া শিশুকালে থাকে অত্যন্ত সহজ ; কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সাপেক্ষ প্রতিবর্ত নীতির সাহায্যে তা' হয়ে দাঁড়ায় অত্যন্ত জটিল। তখন আমরা সাপ, আবছা অন্ধকারে ছায়া, অথবা অন্যান্য অনেক কিছু দেখে ভয় পাই।

যেমন করে উদ্দীপক প্রতিক্রিয়া, ও সাপেক্ষ প্রতিবর্ত নীতির দ্বারা বিশ্লেষণ করে শরীরের আন্তরযন্ত্রীয় আচরণকে ওয়াট্‌সন্ বললেন প্রক্ষোভ, ঠিক ঐ একই নীতির দ্বারা বিশ্লেষণ করে

তিনি দেখালেন কীভাবে গড়ে ওঠে মানুষের কায়িক আচরণ। জন্ম থেকে মানুষের মধ্যে দেখা যায় কতকগুলি প্রাথমিক কায়িক আচরণ। এগুলি হচ্ছে মানুষের শারীরিক ও যান্ত্রিক গঠনের একটি স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। শরীরের গঠনের ও অন্যান্য কলকব্জার সম্পূর্ণতা হলেই দেখা দেয় এই বৈশিষ্ট্য। বিশেষ পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, মাতৃগর্ভের সপ্তম মাস থেকেই শরীরের গঠন ও কলকব্জা মোটামুটি সম্পূর্ণ হয়ে যায়। কাজেই এই বৈশিষ্ট্যগুলিও দেখা দিতে আরম্ভ করে এই সময় থেকে। তিরিশ দিন বয়সের কয়েক শ' ও এক বছর বয়স পর্যন্ত কয়েক শ' শিশুকে বহুদিন ধরে পরীক্ষা করে ওয়াট্‌সন্‌যে-যে প্রাথমিক ও কায়িক আচরণের সন্ধান পেয়েছেন তা এই হাঁচি, কাশি, মাথা, গলা, পা, হাত, আঙ্গুল ইত্যাদি অঙ্গের সঞ্চালক, কান্না, হাসি, যৌনাঙ্গের উত্তেজনা, প্রস্রাব, মলত্যাগ, চোখের আন্দোলন, খাওয়া ইত্যাদি। এই আচরণগুলির প্রত্যেকটিই প্রাথমিক ; কেননা, এদের সঙ্গে এদের উদ্দীপকের সম্বন্ধ অতি প্রত্যক্ষ। কিন্তু এদের সকলের পক্ষে এই প্রাথমিক অবস্থায় দীর্ঘদিন থাকা সম্ভব হয় না। সামাজিক অনুশাসন ও ব্যবহারের ফলে এদের অধিকাংশই দেখা দেয় আমাদের সুনিয়ন্ত্রিত অভ্যাস-রূপে। আবার হয়তো দু' একটি মাত্র র'য়ে যায় প্রাথমিক অবস্থাতে—যেমন হাঁচি। ভূমিষ্ঠ হবার পরমুহূর্ত থেকে এমন কি সম্ভবতঃ তারও কিছু আগে থেকে, প্রত্যেক মানব শিশুর উপর তার পারিপার্শ্বিক থেকে এসে পড়তে থাকে অসংখ্য প্রভাব।

চোখ, নাক, কান, মুখ স্পর্শ ইত্যাদি দ্বারা বাইরের জগত থেকে, আর পাকযন্ত্র, গ্রন্থি, স্নায়ু ইত্যাদি আন্তরযন্ত্রীয় উদ্দীপনা প্রতি মুহূর্তেই তার মধ্যে সাড়া জাগাতে থাকে। এবং মানুষের শারীরিক গঠনের এমনই বৈশিষ্ট্য যে, এই সমস্ত উদ্দীপনার প্রতিক্রিয়া হিসাবে কোন না কোন আচরণ দেখা দেবেই। শিশুকালে এই আচরণগুলি দেখা দেয় প্রধানতঃ আঙ্গুল ও হাত অবলম্বন করে। অর্থাৎ শিশু তার সমস্ত উদ্দীপকের প্রতি সাড়া দেয় হাত ও মাথার সঞ্চালন দ্বারা। ক্রমে ক্রমে এই সঞ্চালন বা প্রতিক্রিয়াগুলি নিয়ন্ত্রিত ও সংক্ষিপ্ত হয়ে আসতে থাকে। কী ভাবে তা সম্ভব হয়, তার উত্তর ওয়াট্সন্ দিয়েছেন তার 'প্রচেষ্টা ও ব্যর্থতা' (trial and error) নীতি দ্বারা।

জন্ম থেকেই বহুপ্রকারের উদ্দীপক দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে প্রতিনিয়তই মানুষের মধ্যে বহুপ্রকারের প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে থাকে। তাদের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়াগুলি ব্যবহারিক জগতে কার্যকরী, পুনঃ পুনঃ আবৃত্তির ফলে সেইগুলিই আমাদের মধ্যে নির্দিষ্ট অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায়; আর যেগুলি তা' নয়, তারা ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে যায়। মনে করা যাক্ ছোট একটি বাক্সের মধ্যে কতকগুলি চকোলেট বিস্কুট পুরে কোন একটি ছোট ছেলেকে তা' দেখানো হলো; তারপর বাক্সটি বন্ধ করে দেওয়া হলো। বাক্সটী খুলতে চাবির প্রয়োজন হয় না; শুধুমাত্র একটি কৌশল জানা থাকলেই হয়, যেমন পিছন

দিকে হয়তো ছোট্ট একটি বোতাম্ আছে, সেইটি টিপে দিলেই বাক্সটি খুলে যাবে। ছেলেটিকে শুধুমাত্র বলে দেওয়া হলো যে, বাক্সটি যদি সে খুলতে পারে তাহলেই খাবারগুলি সে পাবে। এই পরিস্থিতিটি ছেলেটির কাছে নতুন। এক্ষেত্রে সে কী করবে ? বাক্সটি হাতে নেবে ; ঝাঁকুনি দিতে থাকবে ; উল্‌টে ফেলবে ; নানারকম করে পরীক্ষা করতে থাকবে। অর্থাৎ তার আয়ত্তের মধ্যে যতো উপায় আছে সব সে প্রয়োগ করবে। মনে করা যাক যে তার আয়ত্তের মধ্যে আছে মাত্র পঞ্চাশটী উপায় বা প্রতিক্রিয়া আচরণ। এইগুলি একে একে প্রয়োগ করতে করতে হঠাৎ এক সময়ে সে প্রয়োজনীয় বোতামটি টীপে দেবে, এবং বোতামটি খুলে যাবে। মনে করা যাক তার আয়ত্তের মধ্যে যে পঞ্চাশটি আচরণ আছে তারা একে একে এসে যাবার পর এই নতুন আচরণটী দেখা গেলো ; এবং সবশুদ্ধ সময় লাগলো কুড়ি মিনিট। অর্থাৎ হাতে নেবার পর থেকে কুড়ি মিনিট পরে বাক্সটী সে খুললো। তখন তাকে আমরা চকোলেট ইত্যাদি দিলাম ; এবং বাক্সটী আবার বন্ধ করে তার হাতে দিলাম। এই দ্বিতীয়বার তার আচরণ সংখ্যা কমে যাবে, এবং কুড়ি মিনিটের চেয়ে কম সময়ের মধ্যে সে বাক্সটি খুলে ফেল্‌বে। তৃতীয় প্রচেষ্টায় তা আরও কম হবে ; এবং আনুমানিক দশম প্রচেষ্টায় তার আচরণগুলি আর অনিয়ন্ত্রিত নয়। শুধুমাত্র যে অপরিহার্য আচরণের দ্বারা উপস্থিত কাজটি সম্পন্ন হতে পারে সেই আচরণটি র'য়ে যাবে

অন্য সমস্ত অনাবশ্যক আচরণগুলি অদৃশ্য হয়ে গেছে, এবং বাক্‌সটী খুলতে সময় লাগছে মাত্র দু সেকেণ্ড।

এই হচ্ছে আমাদের সমস্ত শিক্ষা বা কায়িক আচরণের মূল কথা। এখানে প্রশ্ন হতে পারে এই যে, যে-আচরণগুলি কার্যকরী হয় তারা টিকে যায়, আর যারা তা হয় না তারা অদৃশ্য হয়ে যায়—তার কারণ কী?—ওয়াট্‌সন্ বললেন; তার কারণ হচ্ছে, কার্যকরী প্রতিক্রিয়াটির ঘটনমাত্রা (Frequency), ও সাম্প্রত্য (recency)। এই দুটি জিনিষ বোঝাবার জন্য ওয়াট্‌সন্ বলছেন : আমরা ঐ ছোট ছেলেটির আচরণগুলিকে ১ থেকে ৫০ পর্যন্ত সংখ্যা দ্বারা অভিহিত করছি। ১ থেকে ৪৯ পর্যন্ত ব্যর্থ আচরণ, আর ৫০ নম্বরেরটি হচ্ছে বোতামটি টিপে দেওয়া। প্রথম প্রচেষ্টায় ছেলেটির আচরণগুলি দেখা যাবে এইভাবে (ধ'রে নেওয়া দৃষ্টান্ত অনুসারে) :—

৪৭, ২১, ৩, ৭, ১৪, ১৬, ১৯, ৩৮, ২৮, ২, ইত্যাদি...৫০

দ্বিতীয় প্রচেষ্টায় :—

১৮, ৬, ৯, ১৬, ২৩, ২৭ ইত্যাদি........৫০

তৃতীয় প্রচেষ্টায় :—

১৭, ১১, ২৯, ৩৩, ২১, ১৮ ইত্যাদি........৫০

নবম প্রচেষ্টায় :—

১৪, ১৮ ইত্যাদি...........৫০

দশম ও পরবর্ত্তী প্রচেষ্টায় :—

৫০

অর্থাৎ ৫০ নম্বরের আচরণটি প্রতি প্রচেষ্টায় এগিয়ে আসতে থাকবে। এবং তার ফলে অন্যান্য অনেকগুলি আচরণ আর অভিব্যক্ত হবার সুযোগ পাবে না। কেননা, যখনই ৫০ নম্বরের প্রতিক্রিয়াটী দেখা দিলো, তখনই ছেলেটি খাবার পেয়ে গেলো; কাজেই অন্য অনেকগুলি আচরণের আর প্রয়োজন হলো না। বাক্সটী খুলে চকোলেট পেতে হলে ৫০ নম্বরের আচরণটি তাই প্রত্যেক প্রচেষ্টায় বর্তমান থাকা অপরিহার্য। অর্থাৎ ৫০ নম্বরের ঘটনমাত্রা অন্য আচরণের চেয়ে অনেক বেশী। দ্বিতীয়তঃ প্রত্যেক প্রচেষ্টায় ৫০ নম্বরটীর পরে আর কোন আচরণ থাকছে না, কাজেই এইটিই সবচেয়ে শেষ আচরণ। ফলে এ খুবই স্বাভাবিক যে, এই আচরণটি প্রত্যেক পরবর্তী প্রচেষ্টায় অনেকটা এগিয়ে আসতে থাকবে। এই এগিয়ে দেখা দেবার নাম সাম্প্রত্য। ঘটনমাত্রা ও সাম্প্রত্যের ফলে ৫০ নম্বরের আচরণটির সঙ্গে উপস্থিত পরিস্থিতির একটি যোগাযোগ স্থাপিত হয়ে গেছে। অর্থাৎ এই আচরণটি এখানে সাপেক্ষ আচরণ। এই সাপেক্ষ আচরণ যখন কয়েকবার আবৃত্ত হলো তখন সেইটেই ছেলেটির অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেলো। পরবর্তী প্রচেষ্টায় তার আচরণ তাই নিয়ন্ত্রিত ও প্রত্যক্ষ।

কায়িক আচরণের এই যে দৃষ্টান্ত দেওয়া হলো তা অত্যন্ত সরল। কিন্তু মানুষের সব আচরণ এতো সরল নয়। পরিণত বয়সের মানুষের অধিকাংশ আচরণই অত্যন্ত জটিল। কিন্তু সেখানেও ঐ নীতির ব্যতিক্রম নেই। জটিল আচরণের বিভিন্ন

অংশগুলির প্রত্যেকটিই ঘটনমাত্রা ও সাম্প্রত্যেরদ্বারা এক একটি সাপেক্ষ আচরণ। এবং তাদের সম্মিলিত প্রতিক্রিয়ায় গড়ে ওঠে এক একটি জটিল আচরণ। এইভাবে যখন বিভিন্ন জ্ঞান ও কর্মেন্দ্রিয়—যেমন, চোখ, কান, নাক ইত্যাদির প্রতিক্রিয়ার সাহায্যে কোন একটা আচরণ আমাদের অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে, তখন দেখা দেয় আর একটি জিনিষ। কোন একটি আচরণ আমাদের অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেলে পরে, চোখ কান নাক ইত্যাদি —যাদের সাহায্যে আমাদের মৌলিক প্রতিক্রিয়াগুলি সম্ভব হয়েছিলো—তাদের প্রয়োজন ক্রমে ক্রমে কমে আসতে থাকে। এতোদিন পর্যন্ত যে-উদ্দীপক এসেছে, তা' চোখ অথবা অন্য কোন ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়ে এসে আমাদের মাংসপেশীকে উদ্দীপ্ত করলেই দেখা দিয়েছে আমাদের শারীরিক প্রতিক্রিয়া। কিন্তু এখন আর চোখ ইত্যাদির কোন প্রয়োজন নেই। বিভিন্ন মাংসপেশীর চঞ্চলতার সঙ্গে আমাদের প্রতিক্রিয়া জড়িত হয়ে গেছে। মাংসপেশীই এখানে মূল উদ্দীপকের কাজ করছে। এবং তারই উদ্দীপনা থেকে আসছে শারীরিক প্রতিক্রিয়া। এইভাবে যখন কোন শারীরিক আচরণ আমাদের মধ্যে গড়ে ওঠে, এবং পুনঃ পুনঃ আবৃত্তির ফলে যখন সেই আচরণ আমাদের নির্দিষ্ট একটি অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায়, তখন যদি কিছুদিন পর্যন্ত সেই অভ্যস্ত আচরণের আবৃত্তি আমরা না করি, অথবা, আচরণবাদীর ভাষায় বলতে হলে, যদি কিছুদিন পর্যন্ত সেই অভ্যস্ত আচরণটি সক্রিয় হবার সুযোগ না পায়,

তাহলে ক্রমে ক্রমে সে লুপ্ত হয়ে যাবে। কোন একটি লোক হয়তো নানা প্রকার সাইকেলের খেলা দেখাতে পারে। দু'তিন বছর অনভ্যাসের ফলে অনেক জিনিষ হয়তো সে আর দেখাতে পারবে না। তার কর্মকুশলতা কমে গেছে। অভ্যাস ও অনভ্যাসের ফলে আচরণের এই যে স্থায়িত্ব অথবা মৃত্যু একেই আমরা সাধারণতঃ বলি স্মৃতি বা বিস্মৃতি। সাধারণতঃ প্রচলিত অর্থে স্মৃতি শব্দের সঙ্গে মন বা চেতনার ধারণা জড়িত হয়ে রয়েছে। কিন্তু আচরণবাদীর ব্যাখ্যায় তা নেই; স্মৃতি হচ্ছে শুধুমাত্র একপ্রকার দৈহিক ও যান্ত্রিক অভ্যাস।

এ পর্যন্ত আমরা দু' শ্রেণীর আচরণের আলোচনা করেছি —আন্তরযন্ত্রীয় ও কায়িক। সেখানে দেখেছি যে, সম্পূর্ণ শরীর বিজ্ঞানের ভিত্তিতে উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়া নীতি দ্বারা ওয়াট্সন্ মানুষের প্রক্ষোভ ও কায়িক আচরণের ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। এখন আমরা দেখবো, ঐ একই নীতির সাহায্যে তিনি মানুষের বাচনিক আচরণেরও ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কথা বলা ও চিন্তা করা—বাচনিক প্রতিক্রিয়ার অন্তর্গত। এতোদিন পর্যন্ত মনোবিজ্ঞানীরা যে জিনিষটিকে 'চিন্তা' নামে অভিহিত করে এসেছেন, ওয়াট্সনের মতে সে জিনিষটা হচ্ছে আমাদের স্বগতোক্তি। চিন্তাকে যে এতোদিন পর্যন্ত একটা অশরীরি ও মানসিক কিছু বলে মনে করা হয়েছে তার কারণ, ওয়াট্সন্ বলেন, গত যুগের মনোবিজ্ঞানে ধর্মের প্রভাব। চিন্তার যে একটা শরীরবৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে,

এবং সে যে নির্দিষ্ট কয়েকটি মাংসপেশীর প্রতিক্রিয়া ভিন্ন আর কিছুই নয়, একথাটা আমরা ভুলে যাই। তার কারণ এই যে, সেই মাংসপেশীর অবস্থান আমাদের দৃষ্টির আড়ালে। সচরাচর তাকে আমরা দেখতে পাই না। প্রকৃতপক্ষে, মূলতঃ কথা বলা ও চিন্তা করার মধ্যে কোন পার্থক্যই নেই। বাঁশীর মুখে ফুঁ দিলে, তার মধ্যে বাতাসের চাপ পড়ে, ও সেই বাতাস ছিদ্রপথে বাইরে বেরিয়ে আসে। ফলে শোনা যায় আওয়াজ। তেমনি, ফুসফুসের চাপে বাতাস কণ্ঠনলী দিয়ে বেরিয়ে আসে ; এবং বেরিয়ে আসার সময়ে জিভ, দাঁত, ঠোঁট ও মুখাভ্যন্তরের মাংসপেশীর সহযোগিতায় যে ধ্বনি নির্গত হয়, তাকেই আমরা বলি 'ভাষা'। শিশুকালে এই ভাষা থাকে প্রাথমিক অবস্থায়, ও অনিয়ন্ত্রিত। তাই সে সময়ে তার কোন স্পষ্ট অর্থ থাকে না। সে তখন শুধুমাত্র একটি শারীরিক প্রতিক্রিয়া। তারপর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেই অস্পষ্ট ভাষা গ্রহণ করতে থাকে নির্দিষ্ট অর্থ ও রূপ। বাস্তব জগতের বিভিন্ন বস্তু প্রসঙ্গে যে নাম বা ভাষা আমরা প্রয়োগ করি, পুনঃ পুনঃ ব্যবহারের ফলে সেই বস্তুর সঙ্গে তার নাম শিশুর আয়ত্ত হয়ে যায়, এবং তার বাচনিক আচরণও সেই অনুসারে নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে। প্রথম জীবনে 'মা' শব্দটি আমরা উচ্চারণ করতে পারি না ; ধ্বনিপ্রচেষ্টা এখানে লক্ষ্যহীন ও অনিয়ন্ত্রিত। কিন্তু বার বার শুনে শুনে, বহুবার চেষ্টা করার পর, প্রচেষ্টা ও ব্যর্থতা

পদ্ধতির দ্বারা অনাবশ্যক প্রচেষ্টা দূর হয়ে যায়, ও উপযুক্ত প্রয়োজনীয় প্রচেষ্টা কার্যকরী হয়। তখন সেই প্রচেষ্টার মধ্যে ধীরে ধীরে 'মা' শব্দটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ওয়াট্সন্ এর নাম দিলেন 'শব্দ অভ্যাস'। ভাষা আয়ত্তের এই হচ্ছে প্রথম স্তর। এর পর দ্বিতীয় স্তরে আসে 'বাক্যঅভ্যাস'। অর্থাৎ একাধিক শব্দের সহযোগিতায় একটি সম্পূর্ণ বাক্য উচ্চারণ। এখানে আর একটি লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, 'মা' শব্দটি যখন আয়ত্তে এসে গেলো, তখন যে শুধু মাত্র 'মা' এই একটি মাত্র শব্দই এই প্রতিক্রিয়াটির উদ্দীপক তাই নয়। অর্থাৎ, বহু প্রচেষ্টা দীর্ঘ আবৃত্তির ফলে 'মা' শব্দটি যখন আমার বাচনিক অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেলো, তখন তার সঙ্গে, অর্থাৎ সেই 'মা' শব্দটির সঙ্গে, এমন যে-কোন জিনিষই আমার মধ্যে 'মা'-শব্দ প্রতিক্রিয়াটি জাগাতে পারে। সাপেক্ষ-প্রতিবর্ত নীতি দ্বারা মূল উদ্দীপক এখানে সরে গেছে, এবং তার জায়গায় দেখা দিয়েছে আর একটি বস্তু। আর, এই জন্যই মায়ের অভাবেও ঐ বাচনিক প্রতিক্রিয়াটি আমাদের মধ্যে দেখা দিতে পারে। ভাষা সম্বন্ধে এই কথা যদি সত্য হয়, তাহলে 'চিন্তাকে' বিশ্লেষণ করাও মোটেই অসুবিধা হবে না। যে পেশী-প্রতিক্রিয়াকে আমরা বল্‌ছি 'ভাষা' বা 'কথা বলা' সেই একই পেশী-প্রতিক্রিয়ার আর একটি রূপ হচ্ছে 'চিন্তা'। যে সমস্ত পেশী ও শরীর যন্ত্রের সাহায্যে কথা উচ্চারিত হয়, ওয়াটসন্ বলেন, তাদের সহযোগিতার রূপ হতে পারে বহু প্রকারের।

বিশেষ এক ধরণের সহযোগিতায় বিশেষ এক ধরণের উচ্চারণকে আমরা বলি উচ্চ আওয়াজ, বা চীৎকার ; আবার অন্য আর এক প্রকারের সহযোগিতায় যে বিশেষ ধ্বনি তাকে বলি স্বাভাবিক কথা বলা ; এবং সেই সহযোগিতা যখন এমনই হয় যে, তার থেকে উদ্ভূত ধ্বনি একমাত্র আমি ভিন্ন আর কেউ শুনতে পায় না, তখনই বলা হয় 'আমি চিন্তা করছি।' অর্থাৎ 'চিন্তা' হচ্ছে অনুচ্চারিত শব্দের সাহায্যে স্বগতোক্তি। আর, তা' নির্ভর করে কণ্ঠনলী, জিভ, দাঁত, ঠোঁট্ ও মুখাভ্যন্তরের মাংসপেশীর সম্মিলিত অভ্যাস ও নিয়ন্ত্রণের উপর। এই নীতি সাধারণ চিন্তার ক্ষেত্রে যেমন সত্য, কাব্য শিল্প ইত্যাদি সৃষ্টির ক্ষেত্রেও তেমনই সত্য। কবিতা রচনা করার সময়ে যা ঘটে সে হচ্ছে এই যে, শব্দ-অভ্যাস ও বাক্য-অভ্যাস যখন আমার মধ্যে বেশ দৃঢ় হয়ে গেছে, তখন সেই শব্দ ও বাক্যকে নিয়ে আমি বিভিন্ন আঙ্গিকে সাজাতে থাকি। একজন সাইকেল চালক যেমন নানারকম ভাবে সাইকেলটিকে নিজের প্রয়োজন মতো নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন, তেমনি শব্দ ও বাক্য অভ্যাসে সুনিপুণ আমিও আমার অভ্যস্ত শব্দ সম্ভার নিয়ে সাজাতে থাকি ; এবং তার ফলে যখন দেখা দেয় নতুন কোন একটি রূপ, তখনই সে হয়ে দাঁড়ায় কবিতা।

আমাদের একটা সাধারণ ধারণা আছে যে, ভাষাকে বাদ দিয়ে চিন্তা সম্ভব নয়। কিন্তু ওয়াট্‌সন বলেন যে, তা সম্ভব। এ সম্বন্ধে তিনি যে যুক্তি দিয়েছেন তা এই :

প্রথমতঃ, মানুষ যখন কোন উদ্দীপকের প্রতি সাড়া দেয়, তখন সেই সাড়া বা প্রতিক্রিয়া আসে সমগ্র শরীর থেকে। ওয়াট্সন্ মানুষের সমগ্র আচরণকে আন্তরযন্ত্রীয়, কায়িক ও বাচনিক,—এই তিন শ্রেণীতে ভাগ করেছেন—তা' আমরা দেখেছি। কিন্তু একথা মনে রাখতে হবে যে, যেকোন প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রেই এই শ্রেণীর আচরণ যুক্ত হ'য়ে থাকে। তবু প্রক্ষোভকে আমরা আন্তরযন্ত্রীয় আচরণ বলি, তার কারণ, ঐ তিন শ্রেণীর আচরণ বর্তমান থাকা সত্ত্বেও আন্তরযন্ত্রীয় আচরণই এখানে প্রধান। তেমনি, যাকে আমরা বলছি বাচনিক প্রতিক্রিয়া, সেখানে বাচনিক আচরণের প্রাধান্য বলেই তাকে ঐ নামে অভিহিত করছি। কিন্তু অন্য দুটি আচরণ—আন্তরযন্ত্রীয় ও কায়িক—তারাও এই বাচনিক আচরণের মধ্যে বর্তমান আছে ; কিন্তু তাদের প্রাধান্য কিছু কম। অর্থাৎ ওয়াটসনের মতে, যে কোন আচরণেই এই তিনটি প্রতিক্রিয়া কমবেশী পরিমাণে বর্তমান। এবং এই তিনটি প্রতিক্রিয়ার সম্মিলিত প্রতিক্রিয়াকেই বলা হচ্ছে সমগ্র শরীর থেকে উদ্ভূত একক প্রতিক্রিয়া। যাকে আমরা বলছি 'চিন্তা', সেখানেও ঐ একক প্রতিক্রিয়া বর্তমান। কিন্তু এই ক্ষেত্রে অন্যান্য প্রতিক্রিয়ার চেয়ে বাচনিক প্রতিক্রিয়ার প্রাধান্য কিছু বেশী ব'লে অন্য দুটির কথা সব সময়ে আমরা খেয়াল রাখি না। কিন্তু পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে, পুনঃ পুনঃ ব্যবহারের ফলে সাপেক্ষ-প্রতিবর্ত নীতিদ্বারা আমাদের মধ্যে

এমন একটা সময় আসে যখন বাচনিক প্রতিক্রিয়াকে বাদ দিয়ে শুধু মাত্র কায়িক ও প্রক্ষোভ-প্রতিক্রিয়ার মাঝ দিয়ে চিন্তার বৈশিষ্ট্য অভিব্যক্ত হতে পারে। অর্থাৎ তখন যে চিন্তা দেখা যায় তার মধ্যে ভাষা থাকে না।

এ পর্যন্ত যা বলা হলো তার থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, আচরণবাদীরা মানুষকে এনে ফেলেছেন অন্যান্য যন্ত্রের সঙ্গে এক শ্রেণীতে। অর্থাৎ ব্যক্তিত্ব বলতে যে জিনিষটি আমরা বুঝি, আচরণবাদীর মতে তা' অর্থহীন। শিক্ষা, পারিপার্শ্বিক ও শারীরিক বিভিন্ন কলকব্জার সহযোগিতায় যে-আচরণ পদ্ধতি মানুষের মধ্যে গড়ে ওঠে, তাকেই ওয়াট্‌সন্ বলেন ব্যক্তিত্ব। একখানা মোটর গাড়ীকে বিচার করতে হলে যেমন আমরা দেখি তার বিভিন্ন কলকব্জার সংগঠন, গতি, আরাম ইত্যাদি; তেমনি মানুষকে বিচারের সময়েও আমরা দেখি কোন রকম পরিস্থিতিতে, কোন আচরণ তার মধ্যে দেখা যাবে; যে রকম তার আচরণ-বৈশিষ্ট্য, তাতে পারিবারিক জীবনে সে কি রকম ব্যবহার করবে। অথবা কি রকম ব্যবহার করবে সমাজ-জীবনে; ধর্ম সম্বন্ধে তার প্রতিক্রিয়া কী রকম; ব্যবসা ক্ষেত্রে তার আচরণ কোন রূপ নেবে; রাজনীতি ক্ষেত্রে তার আচরণ কোন শ্রেণীর। কোন ব্যক্তির শিক্ষা; বয়স, ও তার জীবনের বিভিন্ন ঘটনাবলী ও ইতিহাস যদি জানা থাকে তাহলে তার সম্বন্ধে ধারণা করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে তার সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করাও খুব

অসম্ভব হবে না। কেননা, সমগ্র আচরণ-অভ্যাস যখন বিশেষ একটা রূপ নিয়ে আমার মধ্যে গড়ে উঠেছে, তখন কোন পরিস্থিতিতে আমার প্রতিক্রিয়া কোন রকম হবে তা অনুমান করা সহজ। এর থেকে আর একটা সিদ্ধান্ত সহজেই এসে পড়ে এই যে, 'মনোবিকার' নামে যে-জিনিষটি এতোদিন চ'লে আসছে, এবং আধুনিক যুগে যার সব চেয়ে বড়ো নেতা ফ্রয়েড, তা সম্পূর্ণ অর্থহীন। মানুষের চরিত্র বা আচরণে যে সমস্ত অস্বাভাবিকতা ও বিশৃঙ্খলা, তার কারণ খুঁজতে গিয়ে ফ্রয়েড দৃষ্টি দিয়েছেন মনের দিকে—এ আমরা দেখেছি। কিন্তু ওয়াট্‌সন্ দৃষ্টি দিলেন, তার আচরণবৈশিষ্ট্যের দিকে বা ব্যক্তিত্বের দিকে। আমরা আগেই দেখেছি যে, ওয়াট্‌সনের মতে মানুষের ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক থেকে আগত উদ্দীপকের প্রতি, সংহত ও নিয়ন্ত্রিত সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়ার দ্বারা। কিন্তু কারও আচরণ যদি গড়ে ওঠে এমন পারিপার্শ্বিকের মধ্যে যেখানে তার বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ার মধ্যে কোন সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যাবে না, সেখানেই দেখা দেবে আচরণ-ব্যাধি। নতুন পারিপার্শ্বিকের মধ্যে নিয়ে গিয়ে নতুন উদ্দীপকের সাহায্যে তার আচরণকে যদি আমরা আবার নিয়ন্ত্রিত করতে পারি, তবেই তার মধ্যে দেখা দেবে আর এক নতুন ব্যক্তিত্ব। এই ভাবে যে কোন ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব সুস্থ অথবা অসুস্থ করে তোলার ক্ষমতা আমাদেরই হাতে। কেননা, কোন ব্যক্তিত্ব সুস্থ অথবা অসুস্থ—সেটা নির্ভর করে

আচরণগত সামঞ্জস্য বা অসামঞ্জস্যের উপর, এবং তার ভিত্তি হচ্ছে উদ্দীপক প্রতিক্রিয়া নীতি। মন বা মানসিক কোন কিছুর সঙ্গে কোন যোগ ব্যক্তিত্বের নেই। কাজেই আচরণ ব্যাধির চিকিৎসাও হবে নতুন কোন আচরণের নির্দেশ, যার ফলে পূর্বের অভ্যস্ত আচরণ দূর হয়ে গিয়ে গড়ে উঠতে পারে কোন নতুন সুস্থ আচরণ।

এই হচ্ছে আচরণবাদের মূল কথা। একটু বিচার করলে দেখা যাবে যে, খুব বেশী নতুন কোন কথা আচরণবাদ বলেনি। প্রথমে যখন সে দেখা দিয়েছিলো তখন সে ছিলো শুধুমাত্র একটা পদ্ধতি। মনোবিজ্ঞানের আলোচনায় আমাদের পদ্ধতি হওয়া উচিত বস্তুগত; এবং অন্তর্নিরীক্ষণকে বাদ দেওয়া উচিত—এই কথাই আচরণবাদ বলতে চেয়েছিলো প্রথমে। কিন্তু মনোবিজ্ঞানে বস্তুগত পদ্ধতির প্রবর্তক হিসাবে সম্পূর্ণ কৃতিত্ব বোধহয় আচরণবাদকে দেওয়া যেতে পারে না। তারও আগে এ পদ্ধতির ব্যবহার দেখা যায়। ১৮৮০ সালে গল্‌টন্ (Galton), তাঁর পরীক্ষায় যে পদ্ধতি ব্যবহার করেছিলেন তাও ছিলো সম্পূর্ণ বস্তুগত। এবিংহউস্ (Ebbinghaus) ১৮৮৫ সালে স্মৃতি সম্পর্কে যে বিখ্যাত পরীক্ষা করেছিলেন, সেখানেও তাঁর পদ্ধতি ছিলো সম্পূর্ণ বস্তুগত। এমনকি, মনোবিজ্ঞানের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, গলটন এবং এবিংহউসেরও আগে বস্তুগত পদ্ধতির প্রচলন ছিলো। যে সাপেক্ষ-প্রতিবর্ত-নীতি আচরণবাদের মূলমন্ত্র,

তা-ও প্রকৃত পক্ষে আচরণবাদের নিজস্ব আবিষ্কার নয়। কাজেই মানুষের আচরণ ইত্যাদির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ওয়াট্‌সন্ যে নতুন কোন পদ্ধতির সন্ধান আমাদের দিয়েছেন তাঁর আবিষ্কার থেকে, এমন কথা বোধ হয় বলা চলে না। সাপেক্ষ-প্রতিবর্ত-নীতি তিনি স্পষ্টতঃই নিয়েছিলেন রুশ শরীরবিজ্ঞানী পাভ্‌লভ্ ও বেক্‌টেরেভের কাছ থেকে। গল্‌টন, এবিংহউস ; ও পাভ্‌লভ্, বেক্‌টেরেভের প্রবর্তিত পদ্ধতি যদি বাদ দেওয়া যায়, তাহলে বলা যেতে পারে যে, পদ্ধতির দিক থেকে কোন কিছুই নতুন জিনিষ আচরণবাদ দিতে পারেনি। এমন কি মনোবিজ্ঞান থেকে অন্তর্নিরীক্ষণকে নির্বাসন দেবার কৃতিত্ব-ও আচরণবাদ পেতে পারে কিনা সন্দেহ আছে। কেননা পদ্ধতি হিসাবে অন্তর্নিরীক্ষণকে বাদ দেওয়া বা সম্পূর্ণ অতিক্রম করা এখনও সম্ভব হয়নি। এবং এই পদ্ধতি থেকে এখনও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ফল পাওয়া যাচ্ছে। অনেকেই মনে করেন যে, একে বাদ দেওয়া বোধ হয় একেবারেই সম্ভব নয়। আচরণবাদীরা নিজেদের পরীক্ষায় 'বাচনিক বর্ণনা' (Verbal report) নামে যে-পদ্ধতির সাহায্য নিয়ে থাকেন তাও এই অন্তর্নিরীক্ষণ ভিন্ন আর কিছুই নয়। আসল কথা এই যে, অন্তর্নিরীক্ষণ হলেই যে সে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ও অবৈজ্ঞানিক হয়ে পড়বে তার কোন মানে নেই। সম্পূর্ণ বস্তুগত ও বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতেও তাকে পরীক্ষা করা যেতে পারে। কাজেই তাকে বাদ দেবারও বিশেষ কোন প্রয়োজন নেই।

অবশ্য যদি আমরা মনে করি যে, আচরণবাদ কোন নতুন কথাই বলেনি, কাজেই কোন মূল্যও তার নেই, তাহলে অত্যন্ত ভুল করা হবে। মনোবিজ্ঞানে যে সমস্ত শব্দ আমরা সাধারণতঃ ব্যবহার করে থাকি, আচরণবাদ এসে তাদের অর্থ সম্বন্ধে আমাদের যথেষ্ট সচেতন করেছে। মনোবিজ্ঞানের একটা প্রধান আলোচ্য বিষয় হচ্ছে আচরণ। কিন্তু সেই আচরণের আলোচনায় যে সমস্ত শব্দ ব্যবহার করা হয়ে থাকে তা অনেক সময়ে বাস্তবিকই অত্যন্ত অস্পষ্ট, অনির্দিষ্ট ও অর্থহীন। আচরণবাদের একটা অন্যতম কৃতিত্ব এই যে, আমাদের এই ত্রুটির দিকে সে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এবং তার ফলে আমাদের শব্দ ব্যবহার আজকাল অনেক সতর্ক, স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট হয়ে এসেছে। দ্বিতীয়তঃ, আচরণবাদ আজ আর শুধুমাত্র মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নেই। নিছক এক পদ্ধতি হিসাবে সে আজ সমাজবিজ্ঞান ; ধর্ম, নীতি ইত্যাদির মধ্যেও বিস্তৃত হয়ে পড়েছে। ওয়াট্‌সন দাবী করেন যে, তাঁর এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে দর্শনের রহস্যময়তা ক্রমশঃ দূর হয়ে যাবে, ও সে হয়ে দাঁড়াবে এক বিজ্ঞানের ইতিহাস, পুরানো নীতিশাস্ত্রের বিশুদ্ধ তত্ত্বোপদেশকে সরিয়ে দিয়ে সেখানে দেখা দেবে এক পরীক্ষামূলক নীতিবিদ্যা ; এবং মনোবিশ্লেষণকে সরিয়ে দিয়ে সেখানে আসবে এক বৈজ্ঞানিক আচরণবাদ, যার ফলে মানুষের আচরণকে ইচ্ছা মতো নিয়ন্ত্রণ করা ও তার সম্বন্ধে ভবিষ্যবাণী করাও অত্যন্ত সহজ হয়ে যাবে।

এদিক থেকে আচরণবাদের আবেদন কম নয়; এবং বিশেষ কোন আবিষ্কার অথবা বক্তব্যের অভিনবত্বের চেয়ে আচরণবাদের এই আদর্শগত বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গিই আমাদের কাছে আজ অধিক মূল্যবান।

সমগ্রতাবাদী মনোবিজ্ঞান

আধুনিক মনোবিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার মতোই সমগ্রতাবাদী (Gestalt) মনোবিজ্ঞানেরও জন্ম হয়েছিলো বিদ্রোহের মাঝ দিয়ে। উনবিংশ শতাব্দীতে যে মনোবিজ্ঞানকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিলো, তার বিষয়বস্তু ছিলো সচেতন মন বা চেতনা ; এবং তার পদ্ধতি ছিলো অন্তর্নিরীক্ষণ। আমার মনে যে সচেতন প্রবাহ চলেছে তারই যথাযথ বর্ণনা হলো এই পদ্ধতির মূল কথা। মনোবিজ্ঞানী এলেন, এসে আমাকে বিশেষ কোন একটি কাজ দিলেন। সেই কাজের সময়ে আমার মনের যে অবস্থা আমি উপলব্ধি করেছি, বিনা বিশ্লেষণে ও মন্তব্যে তারই যথাযথ বর্ণনাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠলো এই সময়কার মনোবিজ্ঞান। বিস্তৃত বিশ্লেষণ না করে সংক্ষেপে বলতে গেলে এই মনোবিজ্ঞানের যে বৈশিষ্ট্য তা হচ্ছে (১) মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু হিসেবে নেওয়া হলো সচেতন মন ও তার বৃত্তি সমূহ। (২) মনের প্রত্যেক বৃত্তিই কতকগুলি ক্ষুদ্রতর উপাদানের সংযোগে গঠিত। আমাদের প্রত্যয় অনুভূতি ইত্যাদি এক একটি যৌগিক পদার্থ, এবং এদের জানতে হলে প্রথমে জানতে হবে বিশ্লেষণ করে ঐ উপাদান-গুলিকেই। এই দৃষ্টি ভঙ্গির নাম দেওয়া হয়েছিলো 'মানসিক

রসায়ন আদর্শ' (mental chemistry ideal)। (৩) এর পদ্ধতি হলো অন্তর্নিরীক্ষণ। এই তিনটি বৈশিষ্ট্য নিয়ে এই মনোবিজ্ঞানের নাম দেওয়া হলো 'অবয়বী মনোবিজ্ঞান' (Structural Psychology)। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ও বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে এর প্রতিবাদ হলো, এবং নানাপ্রকার গবেষণা ও পরীক্ষার ভিত্তিতে বলা হলো যে, প্রথমতঃ, মন একটি অবিভাজ্য সক্রিয় পদার্থ, দ্বিতীয়তঃ, অন্তর্নিরীক্ষণ দ্বারা শুধু মাত্র চেতনার মধ্যেই মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুকে সীমাবদ্ধ রাখা চলবে না। মনের বাইরে মানুষের যে আচরণ ও কার্য সম্পাদনা তাকেও, এর মধ্যে নিয়ে আসতে হবে। এই দুই প্রতিবাদ থেকেই জন্ম নিলো আধুনিক মনোবিজ্ঞান। সমগ্রতাবাদী মনোবিজ্ঞান তাদের অন্যতম।

সমগ্রতাবাদী মনোবিজ্ঞানের বিদ্রোহ ছিলো প্রধানতঃ জার্মান দার্শনিক ও মনোবৈজ্ঞানিক Wundt-এর বিরুদ্ধে। Wundt বলেছিলেন যে, আমাদের অভিজ্ঞতা সৃষ্টি হয় কতকগুলি উপাদান সংযোগে। আমাদের প্রত্যেকটি ধারণা, অনুভূতি, সংকল্প ইত্যাদি এক একটি যৌগিক পদার্থ। অতএব মনোবিজ্ঞানের কর্তব্য হলো এই যৌগিক বস্তুটির উপাদানগুলিকে বিশ্লেষণ করা ; এবং পরে লক্ষ্য করা যে কি নিয়মে ও কি ভাবে, সেই উপাদানগুলি সংযুক্ত হয়েছে। আগে বিশ্লেষণ (analysis), ও পরে সংযোজন (synthesis)—এই পদ্ধতির দ্বারা আমাদের

অভিজ্ঞতার মধ্যে কোন মূল নীতির আবিষ্কার করাই ছিলো Wundt-এর উদ্দেশ্য। সমগ্রতাবাদ এই মনোবিজ্ঞানের নাম দিলো 'ইট্ ও চূণ স্থরকির মনোবিজ্ঞান' (Brick and mortar Psychology)। অর্থাৎ অভিজ্ঞতার বিভিন্ন উপাদানগুলি যেন ইট্, যাকে চূণ স্থরকির দ্বারা একত্রে গ্রথিত করে বিশেষ এক অভিজ্ঞতার সৌধ গড়ে তোলা হচ্ছে। কিন্তু প্রশ্ন উঠলো চূণ স্থরকির সম্বন্ধে। কী সেই 'চূণ স্থরকি' যার দ্বারা উপাদানগুলি বিশেষ এক রূপ নিয়ে গড়ে উঠতে পারে?—এই প্রশ্নের কোন সদুত্তর পাওয়া যাচ্ছিলো না। ঠিক এই অবস্থায় হাতের কাছে পাওয়া গেলো আর একটি জিনিষ। Ehrenfel ও অন্যান্য কয়েকজন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করে দেখলেন যে, যে কোন সম্পূর্ণাঙ্গ বস্তুর একটি বিশেষ ধর্ম আছে, যা নাকি তার উপাদান সমূহ থেকে একেবারে আলাদা। যে কোন বস্তুর এই বৈশিষ্ট্যটির নাম এরা দিলেন 'সমগ্রতা ধর্ম' (Gastalt quality)। যেমন, সঙ্গীতের কোন একটি স্থর নির্ভর করে স্বরগ্রামের বিশেষ গঠন পদ্ধতির উপর। ঐ গঠনটি বদলে দিলে একই স্বরগ্রাম নিয়েই স্থরটি বদলে যাবে। অর্থাৎ সঙ্গীতের এমন কোন একটি স্বতন্ত্র রূপ আছে, শুধুমাত্র স্বরগ্রামের সাহায্যে বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়। তাহলে সমগ্রতার এই বৈশিষ্ট্য তার উপাদানের চেয়ে কম প্রয়োজনীয় নয়। এই সত্যটির উল্লেখ করে সমগ্রতাবাদীরা বললেন যে, অভিজ্ঞতার উপাদান বিশ্লেষণ করা মনোবিজ্ঞানের কাজ নয়। তার একমাত্র

কর্তব্য হলো এই সমগ্রতার নিজস্ব কোন নীতি আছে কি না, এবং কেনই বা বিশেষ অবস্থায় সমগ্রতার বিশেষ একটি রূপ দেখা যায়, তারই অনুসন্ধান করা। কেন না, Wundt এর ব্যবহৃত বিশ্লেষণ পদ্ধতি বর্জন করলেও, সমগ্রতাবাদীদের মতে মানসিক ঘটনা সমূহেরও একটা নীতি আছে। তার নাম হলো 'সমগ্রতা নীতি' (wholeness law)। এই নীতিতে বলা হয়েছে যে. মানুষ যখন কোন উদ্দীপনে সাড়া দেয়, তখন সে সাড়া বিচ্ছিন্ন ভাবে আসে না ; সে হচ্ছে সমগ্র পরিস্থিতির প্রতি সমগ্র শরীরি (organism-as-a whole) থেকে উদ্ভূত এক একক প্রতিক্রিয়া (total reaction)। যেমন, একজন শিক্ষক বক্তৃতা দিচ্ছেন। তার সামনে যে জিনিষটি রয়েছে তা' বিশেষ কোন একটি ছাত্র নয়—সমস্ত ছাত্রসমূহের নির্বিশেষ সংহত একটি রূপ, যার নাম হলো ক্লাস। সেই সংহত একক পরিস্থিতির নিজস্ব একটি বৈশিষ্ট্য আছে ; এবং তারই দিকে দৃষ্টি রেখে শিক্ষকটি বক্তৃতা দিচ্ছেন। সেই বৈশিষ্ট্যকে জানতে হলে যে, সুপরিচালিত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষামূলক গবেষণা আবশ্যক, একথা সমগ্রতাবাদীরা অস্বীকার করেন না। বরং নানা পরীক্ষার দ্বারা তারা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন।

১৯১২ সালে এঁদের প্রধান নেতা ওয়েরথাইমের (Wer-theimer) একটি উল্লেখযোগ্য পরীক্ষা করেছিলেন। কোন জিনিষের 'গতি' (motion) সম্বন্ধে কি করে আমাদের জ্ঞান (perception) জন্মে, এই ছিলো তাঁর পরীক্ষার বিষয়। তিনি

দেখলেন যে, আমরা যখন কোন বস্তুকে গতিশীল দেখি তখন সেই গতি আমাদের কাছে একটি প্রবহমান একক (continuous whole) রূপে প্রতিভাত হয়ে থাকে। পর পর কতকগুলি বিন্দুর যোগে গতির যে ধারণা তা ভুল। কোন একজন ধাবমান ব্যক্তিকে হয়তো আমরা দেখছি। সে ক্ষেত্রে ঐ লোকটির অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিশেষ একটি একক গতিই আমাদের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে। কিন্তু ঐ সময়ে যদি ক্যামেরা দ্বারা ঐ লোকটির পর পর কতকগুলি ফটো নেওয়া হয়, তাহলে তার হাত পা ইত্যাদিকে এমন কতকগুলি অবস্থায় দেখা যাবে, যা আমাদের খালি চোখের দৃষ্টিতে ধরা পড়েনি। অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন ও বিভিন্ন অংশগুলিকে অতিক্রম করে গতির একটি নিজস্ব অস্তিত্ব আছে, এবং তাকেই আমরা দেখে থাকি। এই দেখার জন্য বিভিন্ন ও বিছিন্ন অংশগুলি অনাবশ্যক। যে কোন ইন্দ্রিয়ের উদ্দীপনায় মস্তিষ্কের সাড়া দেওয়াকে যদি বলা যায় সংবেদনা (sensation) তাহলে গতিকেও একটি সংবেদনা হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। সমগ্রতানীতির দিকে লক্ষ্য রেখে এইভাবে নানা পরীক্ষা করে এরা প্রমাণ করেছেন যে, স্নায়ুমণ্ডলীর মধ্যে যে কোন একটি স্নায়ু বাইরের উদ্দীপনে উত্তেজিত ও সক্রিয় হলেই সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য স্নায়ুগুলিও উত্তেজিত ও সক্রিয় হয়ে উঠে একটি মণ্ডলীর সৃষ্টি করে। এখন, আমাদের কাজ হলো প্রধানতঃ এই উদ্দীপন মণ্ডলীকে নিয়ে। বিচ্ছিন্ন ও স্থানীয়

একক উদ্দীপন এখানে অর্থহীন। শরীর বিজ্ঞানের দিক থেকে এ যেমন সত্য, ঠিক তেমনই সত্য এ মনোবিজ্ঞানের দিক থেকেও। যখন আমরা কোন বস্তুকে দেখি, তখন সাধারণতঃ দুটি ব্যাপার ঘটে থাকে। প্রথমতঃ বস্তুটির আকৃতির একটি ছাপ (image) আমাদের চোখের উপর পড়ে। দ্বিতীয়তঃ, ঐ ছাপটির একটি অর্থ ও তাৎপর্য আমরা অনুভব করি। একটি মানুষের ছায়া যখন চোখে পড়ে তখন সে শুধু ছায়াই থাকে। কিন্তু তাকে মানুষ ব'লে চিনি বা জানি মাত্র তখনই যখন তার সঙ্গে আরও কতকগুলি আনুষঙ্গিক ধারণা আমরা যোগ করে দিই। মনে করা যাক, চোখ খুলেই আমরা দেখছি সাদা একটি পটভূমির উপর কতকগুলি কালো বিন্দু। বিন্দুগুলিকে আমরা বিচ্ছিন্নভাবে উপলব্ধি করি না। পরস্পরের মধ্যে বিশেষ একটি যোগসূত্র সমন্বিত বিশেষ একটি সংহত, একক ও অর্থপূর্ণ সমগ্র (Coherent whole) রূপে ঐ বিন্দুগুলি আমাদের কাছে প্রতিভাত হবে। সর্বত্র ও সব সময়েই পটভূমির চেয়ে, তার উপরকার এই সংহত সমগ্র রূপটিই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এমন কি মাঝে মাঝে ফাঁক ও বিরতি (gap) বিশিষ্ট যদি কোন একটি আকৃতি (Figure) অঙ্কন করা যায়, তাহলেও ঐ ফাঁকগুলিকে উপেক্ষা করেই আমরা আকৃতিটিকে একটি সমগ্ররূপে দেখে থাকি। এর কারণ হলো স্নায়ুমণ্ডলী ও মনের সমগ্রতানীতি। এই নীতির ফলে সব কিছুরই ফাঁক বা শূন্যতা কিংবা অসম্পূর্ণতাকে তুচ্ছ

করা মানুষের একটি বিশেষ প্রবণতা, এবং সমগ্রতাবাদীরা মনে করেন যে, এই প্রবণতা মস্তিষ্কের গতি-ধর্মের (dynamics of brain activity) পরিচায়ক। মস্তিষ্কের ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্যই এই যে, কোন অসম্পূর্ণতার মধ্যে সে স্থির থাকতে পারে না। কেননা, কোন প্রকার অসম্পূর্ণতা থাকলেই মস্তিষ্কক্রিয়ার সাম্য নষ্ট হয়ে, সেখানে জেগে ওঠে এক প্রকার চঞ্চলতা ; এবং এই অসম্পূর্ণতা দূর হলেই আসে সাম্য ও স্থৈর্য।

কোন বিষয়ের জ্ঞান আমাদের মধ্যে কিভাবে জন্মে ও সেই জ্ঞানের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কি জিনিষ আমরা পাই, সে বিষয়ে সমগ্রতাবাদের মতামত নিয়ে এতোক্ষণ আমরা আলোচনা করেছি। এরই ভিত্তিতে আচরণ সম্বন্ধেও এঁরা যা বলেন তাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আচরণবাদীদের উদ্দীপন-সাড়া (stimulus-response) নীতি এঁরা পছন্দ করেন না। এঁরা বিশ্বাস করেন না যে, শুধুমাত্র উদ্দীপনসাড়া নীতি দিয়েই কোন আচরণ ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। জন্মের মুহূর্ত থেকে কতকগুলি বিচ্ছিন্ন প্রতিক্ষেপ ক্রিয়ার (reflex action) পুনঃ পুনঃ আবৃত্তির ফলে তারাই শেষ পর্যন্ত আমাদের আচরণে দাঁড়িয়ে যায়—একথা এরা সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন। অতি শৈশব অবস্থায় আমাদের আচরণের শৃঙ্খলা থাকে অপরিণত ; এবং ক্রমাগত আবেষ্টনীর সঙ্গে খাপ খাওয়াতে খাওয়াতে সংবেদক (sensory)

ও গতিসঞ্চালক (motor)—এই দুই দিক থেকেই সুনিয়ন্ত্রিত হয়ে সে সমগ্র শরীরির একক আচরণ হয়ে দাঁড়ায়। আচরণ-বাদীদের মধ্যে অনেকের ধারণা ছিলো যে, আচরণ সম্বন্ধে গবেষণা ও পরীক্ষার জন্য আবেষ্টনীর দিকে দৃষ্টি দেওয়ার কোন আবশ্যকই নেই। আবেষ্টনীকে (environment) বাদ দিয়েই আচরণের বিচার ও বিশ্লেষণ চলতে পারে। সমগ্রতাবাদ এ কথা স্বীকার করলো না। সমগ্রতাবাদীরা বললেন যে, আবেষ্টনীর প্রতি প্রাণীর যে গতি সঞ্চালক ক্রিয়া তাকে পরীক্ষা করবো, অথচ সেই আবেষ্টনী সম্বন্ধেই থাকবো উদাসীন—এধরণের কথা হাস্যকর। সংবেদক ও প্রত্যয়জ্ঞানের মাঝ দিয়ে সেই আবেষ্টনী, প্রাণীর কাছে কি ভাবে প্রতিভাত হয়, অন্ততঃ সেটুকু না জানলে তার কোন আচরণেরই তাৎপর্য আমরা উপলব্ধি করতে পারবো না। আচরণ অথবা আবেষ্টনী, এর কোন একটিকেই অন্যটি থেকে আলাদা করা যায় না। কেননা, তাদের মধ্যে বিশেষ যোগাযোগ আছে, এবং সেই যোগাযোগ থেকে জন্ম নেয় প্রাণীর একক আচরণ। সেই একক আচরণ গোড়া থেকেই বিশেষ এক উদ্দেশ্য-অভিমুখীন। অবশ্য উদ্দীপন সাড়ার মধ্যে যে সংযোগ আছে সেকথা এরা অস্বীকার করেন না। এরা বলেন, শুধু মাত্র সেই সংযোগের সাহায্যেই মানুষের সমস্ত আচরণ ব্যাখ্যা করা যায় না। একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। ডাক বাক্সে ফেলার জন্য একখানি চিঠি পকেটে নিয়ে আমি বেরিয়েছি। আমার সতর্ক দৃষ্টি

রয়েছে পথের দু'দিকে। কোন এক জায়গায় একটি ডাক বাক্স দেখতে পেয়েই তার মধ্যে চিঠিখানা ফেলে দিলাম। এখানে উদ্দীপন হলো ডাক বাক্স, আর সাড়া হলো পকেট থেকে বের করে চিঠিখানা সেই বাক্সে ফেলে দেওয়া। আচরণ-বাদীদের মতে অভ্যাস দ্বারা উদ্দীপন-সাড়ার সংযোগ দৃঢ় হয়। আর, একথা সত্য হলে, বলতে হয় যে, দ্বিতীয় আর একটি বাক্স দেখলেই—আমার হাতখানা আপনা থেকেই পকেটের মধ্যে চলে যাবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা হয় না। বরং ডাক বাক্সে ফেলার পর ও বিষয় সাধারণতঃ আমরা ভুলেই যাই। এই যুক্তি দেখে সমগ্রতাবাদীরা বলেন যে উদ্দীপন-সাড়া সংযোগকে আমাদের আচরণের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে না। বরং বলা যেতে পারে যে, একপ্রকার উত্তেজনা (tension) থেকেই আচরণের জন্ম। মস্তিষ্কের ধর্মই এই যে তার প্রতিক্রিয়া চলে একটি সম্পূর্ণ বৃত্তের আকারে। চিঠিখানা ডাক বাক্সে ফেলে দেওয়াতে সেই বৃত্তটি সম্পূর্ণ হয়ে উত্তেজনার উপশম হয়েছে। এই জিনিষটির এরা নাম দিলেন "শূন্য স্থান পূরণ নীতি" (closing the gap)। আমাদের সমস্ত আচরণের বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে এই যে তারা সব সময়েই তাদের বৃত্তটি সম্পূর্ণ পরিক্রমা করে একটি সম্পূর্ণতা চায়। অর্থাৎ যে কোন আচরণই অনুষ্ঠিত হোক না কেন, যতোক্ষণ পর্যন্ত তা সম্পূর্ণ না হচ্ছে ততোক্ষণ আমাদের শান্তি নেই। এই অশান্তির ভাবটাই কার্যের শূন্য স্থান। একে

পূরণ করার দিকেই আমাদের স্বাভাবিক ঝোঁক এবং পূরণ হয়ে গেলেই আমরা শান্তি পাই।

একদল ছাত্রকে একবার কতকগুলি ছবির নক্‌সা আঁকতে দেওয়া হয়েছিলো। তারা কাজ আরম্ভ করে দিলে তাদের কাছে গিয়ে তাদের কাজে বাধা দেওয়া হলো। পরে সমগ্র দলটির প্রত্যেককেই, সে কি কি করেছে তার বিবৃতি দিতে বলা হয়। ফলে, দেখা গেলো যে, যাদের কাজে বাধা দেওয়া হয়েছিলো, তারা নিজ নিজ কাজের শতকরা নব্বুই ভাগ স্মরণ করতে পারে। অথচ যাদের কোন রকম বাধা দেওয়া হয়নি তারা প্রায় কিছুই মনে করতে পারে না। এই পরীক্ষা থেকেও সমগ্রতানীতির সমর্থন পাওয়া যায়। যে কোন কাজ একবার আরম্ভ হলে তা অসম্পূর্ণ অবস্থায় মাঝখানে থেমে থাকতে পারে না। সে সম্পূর্ণতার দাবী করে। ফলে সৃষ্টি হয় উত্তেজনা—তাকে তাই আমরা ভুলতে পারি না। কিন্তু যা শেষ হয়ে গেছে, যার মধ্যে কোন উত্তেজনার অবকাশ নেই তা আমরা ভুলে যাই।

এই থেকে এসে পড়ে শিক্ষার প্রশ্ন। কোন্ কাজ আমরা কোন্ নীতি অনুসারে শিখি, এবং তার বৈশিষ্ট্যই বা কি? এই প্রশ্নের উত্তর এরা দিলেন সমগ্রতানীতির সাহায্যে। এদের মতে শিক্ষার প্রথম কথা হলো অভিপ্রায় বা লক্ষ্য। আচরণ-বাদীদের মতে আমাদের সমস্ত শিক্ষার মূলেই হলো 'উদ্যম ও ব্যর্থতা' পদ্ধতি। অর্থাৎ পারিপার্শ্বিকের সম্বন্ধে বিশেষ কোন

ধারণা নিয়ে নিতান্ত আন্দাজের দ্বারা পরিচালিত আমাদের যে সমস্ত আচরণ দৈবাৎ অভিপ্রেত সফলতা লাভ করতে সমর্থ হয়, তারাই টিঁকে যায়, এবং অন্য সব আচরণ আপনা থেকেই অবলুপ্ত হয়ে যায়। এই ভাবেই গড়ে ওঠে আমাদের জীবন। চিন্তা ও যুক্তি-ক্রিয়ার ব্যাখ্যাও এরা দিতে চাইলেন এই দিক থেকে। বললেন, মানুষের উপর পারিপার্শ্বিকের প্রভাব বহু, এবং প্রভাবের প্রতিক্রিয়াও বহুবিধ। আর, এই প্রভাব ও তার প্রতিক্রিয়াকে অবলম্বন করেই গড়ে ওঠে মানুষের চিন্তা ও যুক্তি। অর্থাৎ চিন্তা ও যুক্তিও এক প্রকার শারীরিক আচরণ। অন্যান্য দৈহিক আচরণের সঙ্গে এর পার্থক্য এই যে, এরা থাকে শরীরের অভ্যন্তরে এবং এদের দেখা যায় না। মোটের উপর, নিম্নস্তরের প্রাণী থেকে মানুষ পর্যন্ত সর্বত্রই মূল কথা হলো আচরণ। মন ও মানসিক বৃত্তি সমূহেরও ভিত্তি এই আচরণের মধ্যেই। বাইরের জগৎ থেকে উদ্দীপন এসে স্নায়ুমণ্ডলীকে উদ্দীপ্ত করে, ফলে প্রাণী-সমূহের মধ্যে দেখা দেয় শারীরিক প্রতিক্রিয়া। আচরণবাদীদের মতে, এই উদ্দীপন ও প্রতিক্রয়ার সংযোগেই আমাদের সমগ্র ব্যক্তিত্ব নিয়ন্ত্রিত। সমগ্রতাবাদীরা বললেন যে, শিক্ষার মধ্যে এ রকম যান্ত্রিক পদ্ধতি নেই। কেননা, আমাদের আচরণ অনুষ্ঠিত হয় কোন এক বিশেষ লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে। নিম্নস্তরের প্রাণীর মধ্যে এই লক্ষ্য অনেকটা সরল। মানুষের ক্ষেত্রে তা যেমন বহুমুখী তেমনই জটিল। অবশ্য এ থেকে একথা মনে করা সঙ্গত হবে না যে,

যে-কোন একটি শিক্ষার ব্যাপারে একাধিক লক্ষ্য থাকে। সমগ্রতাবাদীদের মধ্যে শিক্ষার ক্ষেত্রে এই লক্ষ্য বস্তুটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বিশেষ কোন লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে তারই আলোকে সমগ্র পরিস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে সামগ্রিকভাবে শরীরি জীবের যে একক প্রতিক্রিয়ামূলক আচরণ তাকেই এরা বলেন শিক্ষা। আর এই শিক্ষার সম্বন্ধে দ্বিতীয় কথা হচ্ছে অন্তর্দৃষ্টি (insight)। অর্থাৎ সমগ্র পারিপার্শ্বিকের ঘটনাসমূহ ও তাদের পারস্পরিক যোগাযোগ সম্বন্ধে বিশেষ বোধ থেকে জাত, উপস্থিত পরিস্থিতি সম্বন্ধে এক সুস্পষ্ট ধারণা বা জ্ঞান। উপস্থিত পারিপার্শ্বিক বা পরিস্থিতি সম্বন্ধে একটি সুস্পষ্ট ও সামঞ্জস্যপূর্ণ রূপ ও অর্থ উপলব্ধি করাই হলো জ্ঞান বা অন্তর্দৃষ্টি। শিম্পাঞ্জি ইত্যাদি নিয়ে পরীক্ষা করে সমগ্রতাবাদীরা এই অন্তর্দৃষ্টির যথেষ্ট প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন।

উপরে যে কথা বলা হলো তার থেকে বোঝা যাবে যে, শিক্ষার ক্ষেত্রে সমগ্রতাবাদীরা প্রত্যয়কে (perception) বিশেষ প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। আমরা আগেই দেখেছি যে, এঁদের মতে কোন কিছুই আমরা বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত ভাবে দেখি না। সবকিছুই আমাদের প্রত্যয় গোচর হয় বিশেষ এক সংহত ও সমগ্ররূপে। শিক্ষার ক্ষেত্রেও এই বৈশিষ্ট্যটি বর্তমান। আমার লক্ষ্য ও বর্তমান পারিপার্শ্বিকের মধ্যে র'য়েছে এক ফাঁক বা বিচ্ছেদ। এই বিচ্ছেদ বা ফাঁক পূরণ

করে লক্ষ্য ও পারিপার্শ্বিকের মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিশেষ একটি রূপ প্রত্যক্ষ করাই শিক্ষার মূল। মনে করা যাক্ যে 'ক' ও 'খ' চিহ্নিত দুটি ছোট বাক্স আছে। 'খ'য়ের মধ্যে আছে কিছু খাবার। 'ক'-এর রং গাঢ় লাল, ও 'খ'-এর রং ফিকে লাল। একটি বিড়ালকে বাক্স দুটির সামনে ছেড়ে দেওয়া হলো। কিছুক্ষণ পরে বিড়ালটি যখন জেনে যাবে যে, খাবার আছে 'খ' বাক্সে তখন সে ঐ বাক্সটির আশে পাশেই ঘুরতে থাকবে। এই অবস্থায় বিড়ালটির অনুপস্থিতিতে কোন এক সময়ে তার অলক্ষ্যে 'ক' বাক্সটি সরিয়ে, তার জায়গায় রেখে দেওয়া হলো আর একটি বাক্স'গ' চিহ্নিত। 'গ'-য়ের রং 'খ'-এর চেয়েও অধিকতর ফিকে লাল। এই বার দেখা গেলো যে, বিড়ালটি 'খ'-এর কাছে যাচ্ছেনা, যাচ্ছে 'গ'-এর কাছে। এর থেকে প্রমাণ হচ্ছে যে, বিশেষ কোন কিছুর সঙ্গে উদ্দীপন সাড়া সংযোগটাই আসল কথা নয়; আসল কথা হচ্ছে পরিস্থিতি সম্বন্ধে চেতনা, ও পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ বোধ। এখানে সেই বোধ হচ্ছে 'একটি অন্যটির চেয়ে কম লাল'—এই প্রত্যয়।

এতোক্ষণ পর্যন্ত যে আলোচনা আমরা করেছি তার থেকে একটি বিষয় আমাদের সামনে পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। প্রত্যয়, আচরণ, শিক্ষা—যে কোন দিকেই হোক, সমগ্রতাবাদীদের মতে একটা ঐক্য, একটা সমগ্রতা সেখানে সব সময়েই বর্তমান। অর্থাৎ তাঁরা বলতে চান যে, জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয়;

মনোজগত ও বস্তুজগত, এরা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন নয়। Wundt, Stout প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানীরা বলেছিলেন যে, মানসিক ক্রিয়া ও শারীরিক ক্রিয়া—এ দু'টো আলাদা বস্তু। সমগ্রতাবাদীরা বললেন এ ধারণা ভুল। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে আলাদা হলেও দেহ ও মন পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও বিরোধী নয়, বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ একটি ঐক্য সূত্রে তারা মিলিত হয়ে আছে। এই ঐক্য হচ্ছে একটি সক্রিয় রূপ-নীতি (dynamic form or pattern), ও পটভূমি (field)। যে কোন ক্ষেত্রে, মানসিক ও দৈহিক ক্রিয়া হচ্ছে একই পটভূমির অন্তর্ভূক্ত, ও একই সক্রিয় রূপনীতির দ্বারা সংযুক্ত। অর্থাৎ কোন একটি সমগ্র বস্তুর অংশবিশেষের যা বৈশিষ্ট্য, তা, নির্ধারিত হয় সেই সমগ্রতারই অন্তর্নিহিত নীতির দ্বারা।

পূর্ববর্তী মনোবিজ্ঞানীরা আমাদের মানসিক বা দৈহিক যে কোন আচরণকে তাদের বিভিন্ন উপাদান কণিকাসমূহে বিশ্লেষণ করে তবেই আচরণ সম্বন্ধে বুঝতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সমগ্রতাবাদীরা বললেন যে, এ পদ্ধতিতে আমরা কিছু লাভ করতে পারবো না। কেননা, বিচ্ছিন্নভাবে এই সমস্ত উপাদান কণিকার কোন অর্থ নেই; তাদের মধ্যে যে ঐক্য বিদ্যমান, ও যে বৃহত্তর পটভূমির ভিত্তিতে তারা সম্মিলিত হচ্ছে, সেই ঐক্য, সেই পটভূমি (large field-events) এর আলোকেই তাদের অর্থ ও সার্থকতা। একটা সাধারণ দৃষ্টান্ত নিয়ে বিষয়টি বোঝা যেতে পারে। হাত পা মাথা

প্রভৃতি যদি কোন মানুষের দেহ থেকে আলাদা করে নেওয়া যায়, তাহলে আর যাই কিছু হোক এদের প্রকৃত অর্থ, সার্থকতা ও উদ্দেশ্য আমরা বুঝতে পারবো না। নিজের বাইরে বৃহত্তর আর একটি অর্থ নিয়ে যে সমগ্র শরীর তারই সঙ্গে যুক্ত হলে তবেই এদের সম্পূর্ণ অর্থ বোঝা যাবে। আবার, ব্যক্তি মানুষকেও সম্পূর্ণ বোঝা যাবে না যদি তাকে বিচ্ছিন্ন করে নেওয়া যায় তারও বাইরে আর একটি বৃহত্তর অর্থ নিয়ে যে সমাজ তার থেকে। এমনি ভাবে সমস্ত বিষয়েই দেখা যাবে, কোন কিছুই স্বয়ং সম্পূর্ণ নয়; পরস্পরের সঙ্গে এক ঐক্য সূত্রে মিলিত হয়ে বৃহত্তর একটি অর্থের মধ্যে প্রত্যেকেই উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে আর একটি অভিনব রূপে। সমগ্রতা-বাদীরা এই সত্যটির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তাঁরা বলছেন যে, আমাদের আচরণ, জ্ঞান প্রভৃতি আলোচনার সময়ে এই সত্যটি মনে রাখতে হবে। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়—এ দু'টো আলাদা পদার্থ নয়—একই বৃহত্তর পটভূমিরই দুটি অঙ্গ এরা পরস্পর পরিপূরক সেই বৃহত্তর পটভূমির অর্থেই তাদের সম্মিলিত সার্থকতা। এবং সেই পটভূমি হচ্ছে আত্মার (Spirit, Self, Ego) অভিব্যক্তি প্রচেষ্টা। আর এই অভিব্যক্তি প্রচেষ্টারই সাধারণ রূপ হচ্ছে সমগ্রতা। তাহলে এই সমগ্রতার দৃষ্টি থেকে বিচার করলে আমাদের কর্তব্যই হবে, আলোচ্য বিষয়টি কোন বৃহত্তর অর্থের অংশ; এবং সেই বৃহত্তর অর্থের অভিব্যক্তিতে তার মূল্য কতোটুকু তার বিচার করা।

সমগ্র শারীর যন্ত্রই (organism) চায় নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে, সাম্য ও সংহতি অক্ষুণ্ণ রাখতে। কিন্তু নিয়ত পরিবর্তনশীল ঘটনা প্রবাহের মধ্যে নিয়তই দেখা যায় একটা দ্বন্দ্বের ভাব ; এবং সেই দ্বন্দ্বকে অতিক্রম করে অধিকতর উন্নত, সংহত ও বৃহত্তর আর এক পটভূমির মধ্যে নিজেদের মিলিয়ে নিয়ে তবেই সেই দ্বন্দ্বের অবসান। এই জন্যই সমগ্রতাবাদীরা বলছেন যে "কোন আচরণকে বুঝতে হলে, তার সামাজিক পরিবেশটিকে না বুঝলে তাকে বোঝা যাবে না।" সমগ্রতাবাদ আরম্ভ হয়েছিলো 'প্রত্যয়' নিয়ে। কিন্তু প্রত্যয় সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে এরা এসে পৌছলেন এঁদের সমগ্রতা ও ঐক্যের ধারণায়। এই সমগ্রতা ও ঐক্যের ধারণাটাই বোধ হয় আজ এদের সবচেয়ে বড়ো কথা। এবং এদের যে কথা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে সব চেয়ে বেশী সে-ও হচ্ছে এই সমগ্রতা ও ঐক্যেরই কথা। দেহ ও মন ; জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় ; সমাজ ও ব্যক্তি ; মানুষ ও প্রকৃতি—এদের কেউই অন্যের থেকে বিচ্ছিন্ন নয় ; বরং এক গতি-ধর্মের ক্রমিক অভিব্যক্তিমাত্র ; এবং সেই অভিব্যক্তি প্রবাহ ঐক্য-মূলক। এটা শুধু মাত্র প্রত্যয়, অথবা আচরণ অথবা জ্ঞান সম্পর্কের কথা নয়। এ হচ্ছে সমগ্র জগত ও জীবন সম্বন্ধে একটা একক দৃষ্টিভঙ্গি। অর্থাৎ সমগ্রতাবাদ শেষ পর্যন্ত যেখানে এসে পৌঁছেছে সে হচ্ছে দর্শনশাস্ত্রের অন্তর্গত—বিশুদ্ধ মনোবিজ্ঞান নয়।

শেষ

পরিভাষা

Affection—সংবেদন

Anesthesia—অসংবেদনা

Anal phase—পায়ুকাম (স্তর)

Archetype—আদিম প্রতীক

Association of ideas—ভাবসাহচর্য

Attention—অভিনিবেশ

Attitude—ভঙ্গিমা

Auto-eroticism—আত্মরতি

Behaviour—আচরণ

Behaviourism—আচরণবাদ

Brain—মস্তিষ্ক,

Catharsis—বিরেচন

Chronological age—কালগত বয়স

Condensation—সংক্ষেপন,

Conditioned reflex—সাপেক্ষ প্রতিবর্ত

Cognition—জ্ঞান

Colour-blind—বর্ণান্ধ

Complx—গূঢ়ৈষণা

Conation—ক্রিয়াপ্রবণতা

Conscious—সংজ্ঞান

Desire—কামনা

Displacement—অভিক্রান্তি
Disposition—মেজাজ
Dissociation—বিষঙ্গ
Dramatisation—নাটজ
Dynamico—গতিধর্ম
Ego—অহং
Egoism—আত্মবোধ, অহংকার
Emotion—প্রক্ষোভ
End-pleasure—চরম আনন্দ
Environment—আবেষ্টনী, পরিবেশ
Erogenous Zone—কামস্থান
Extrovert—বহির্মুখীন
Fetishism—বিকল্পকাম
Fore-pleasure—গৌণ আনন্দ
Free association—অবাধ-অনুষঙ্গ
Frequency—ঘটনমাত্রা
Functional Psychology—বৃত্তি মনোবিজ্ঞান
Genital—লৈঙ্গিক
Gestalt—সমগ্রতা
Goal—লক্ষ্য
Hallucination—ভ্রান্ত প্রত্যয়
Hedonism—সুখবাদ
Homo-Sexuality—সমকামিতা
Hormic—এষণাবাদী

Hyperesthasia—অতি-সংবেদনা

Hypesthesia—মৃদু সংবেদনা,

Id—আদিম প্রবৃত্তি

Ideo-mator action—ভাব-আবেগ সমন্বিত আচরণ,

Illusion—বিকল্প প্রত্যয়

Image—প্রতিরূপ

Impulse—আবেগ

Individual Psychology—ব্যক্তিমনোবিজ্ঞান

Inferiority feeling—হীনতাবোধ

Innate—সহজাত

Insight—অন্তর্দৃষ্টি

Instinct—প্রবণতা

Intelligence—বুদ্ধি

Intelligence quatient—বুদ্ধিমান

Introspection—অন্তর্নিরীক্ষণ

Introvert—অন্তর্মুখীন

Latent Content—অব্যক্ত উপাদান

Libido—কামশক্তি, কামপ্রবৃত্তি

Life-plan—জীবন-রূপ

Localisation—স্থান কেন্দ্রীকরণ

Manifest Content—ব্যক্ত উপাদান

Masculine protest—পৌরুষবোধ

Masochism—আত্মধর্ষকাম

Maturation—সম্পূর্ণতা

Mental age—বুদ্ধিগত বয়স
Motion—গতি
Motivation—প্রেরণা
Narcissm—স্বকাম
Needs—আকূতি
Neurosis—উদ্বায়ু
Oral phase—মুখকাম (স্তর)
Organism—শারীরি
Paresthesia—নিরালম্ব সংবেদনা
Perception—প্রত্যয়
Phantasy—মনঃ সৃষ্টি
Preconscious—আসংজ্ঞান
Primardial—আদিম
Psyche—মন, চেতস্
Psychical Causation—চেতসিক কার্যকারণ
Psycho-analysis—মনঃসমীক্ষণ
Psychology—মনোবিজ্ঞান
Purposive—উদ্দেশ্যমূলক
Reaction—প্রতিক্রিয়া
Recency—সাম্প্রত্য
Reflex action—প্রতিক্ষেপ ক্রিয়া
Regression—প্রত্যাবর্তন
Repression—অবদমন
Response—সাড়া

Sadism—ধর্ষকাম

Secondary daboration—অনুযোজনা

Sensation—সংবেদন

Sentiment—অনুরাগ

Stimulus—উদ্দীপন

Structural Psychology—অবয়বী মনোবিজ্ঞান

Sublimation—উদ্‌গতি

Suggestion—অনুজ্ঞা

Symbol—প্রতীক

Tendency—প্রবণতা

Tension—পীড়া, যন্ত্রণাবোধ

Trial and error—উদ্যম ও ব্যর্থতা

Unconscious—নির্জ্ঞান

Verbal report—বাচনিক বর্ণনা

Will—ইচ্ছা

গ্রন্থপঞ্জী

এই বই লেখার জন্য যে সব বই থেকে সাহায্য নেওয়া হয়েছে, এবং এই বইয়ের বিভিন্ন অধ্যায়ে আলোচিত বিষয়বস্তু সম্বন্ধে মূল লেখকেরা যে সব বই লিখেছেন, তার ভিতর থেকে প্রধান কয়েকখানার নাম এখানে দেওয়া হলো। বিশেষ আগ্রহ থাকলে এগুলি পড়ে নেওয়া যেতে পারবে।

Wood-worth, R. S.—Contemporary Schools of Psychology.
Murphy, C.—An Historical Introduction to modern Psychology.
Flugel, J. C.—The hundred years of Psychology.
Hart, B.—Psychology of Insanity.
Freud, S.—Introductory Lectures on Psycho-analysis.
Freud, S,—Basic Writings of,
Jones, Ernest—What is Psycho-analysis ?
Bjerre, P.—The History and Practice of Psycho-analysis.
Hendrick, I—Facts and Theories of Psycho-analysis,
Jung, C. G.—Contribution to Analytical Psychology.
Jung, C. G.—Collected Papers on Analytical Psychology.
Jacabi, J.—The Psychology of Jung.
Adler, A.—Individual Psycholocy.
Macdougall, W.—Outline of Psychology.
Macdougall, W.—An Introduction to Social Psychology.
Kohler, W.—Gestalt Psychology.
Watson. J. B.—Psychology.
Weiss, A. P.—A Theoretical Basis of Human Behavior.